পরমাণু বোমা এবং আমরা

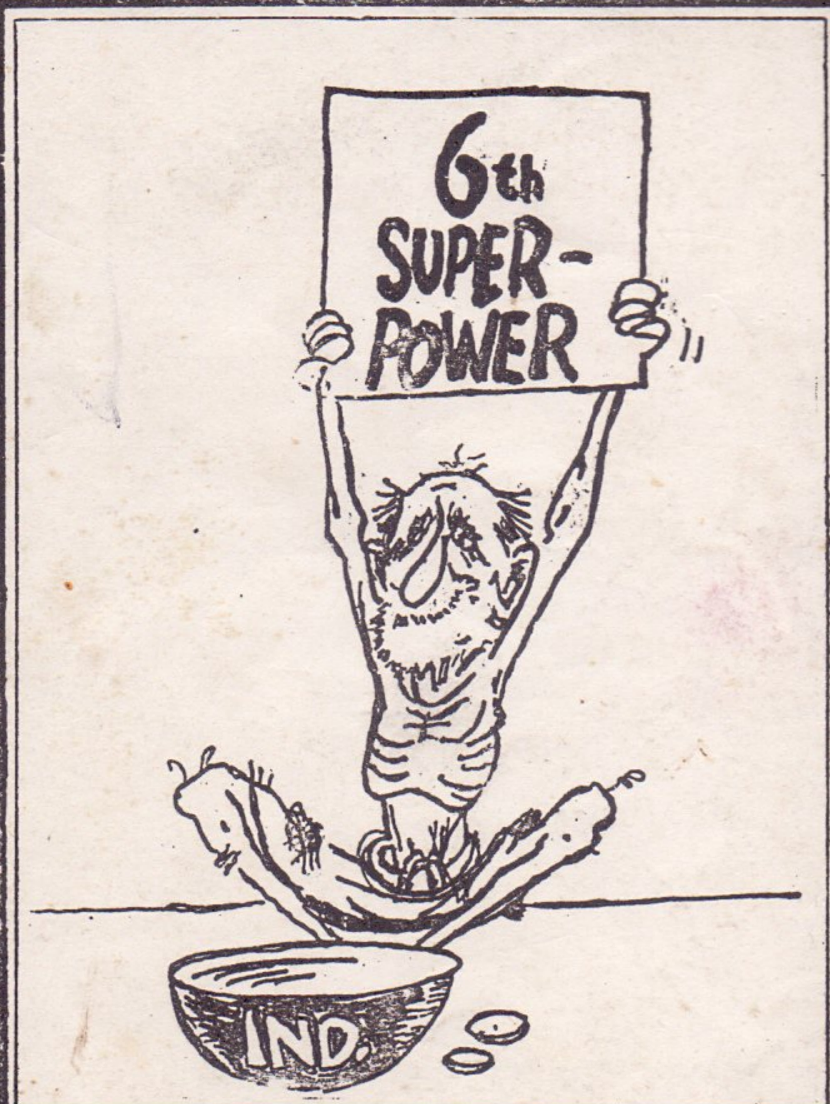

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গ পরমাণু অস্ত্র বিরোধী আন্দোলন কোন নতুন আন্দোলন নয়। এর শুরু '৪৭-এর অব্যবহিত পর থেকেই। ১৯৮২ সালের ৬ই আগস্ট হিরোসিমা দিবসে কলকাতার এক ঐতিহাসিক মিছিলের অন্যতম আয়োজক হিসাবে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের পথচলা শুরু এবং পরমাণু শক্তি ও যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের শরিক হওয়া। আমরা মনে করি সামগ্রিক ভাবে পরমাণু শক্তি ও প্রযুক্তিকে আড়ালে রেখে শুধুই পরমাণু অস্ত্রের বিরোধিতা অর্থহীন। পশ্চিমবঙ্গে একটি পরমাণু রিয়াক্টর বসাবার সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচার তাই আমরা শুরু থেকেই চালিয়ে আসছি। সমন্বয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনেরও অন্যতম প্রধান কর্মসূচী পরমাণু শক্তি ও অস্ত্র বিরোধী প্রচার। ৫ই জুন, ১৯৯২ কলকাতায় অনুষ্ঠিত গণ অবস্থানের মধ্যে দিয়ে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণকে সামগ্রিক পরিবেশ সমস্যার একটি প্রধান বিষয় হিসাবে তুলে ধরা হয়। ১৩ই মার্চ ১৯৯৩ কলকাতায় পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে একটি কন্‌ভেনশনের আয়োজন করা হয়। বহু বুদ্ধিজীবী অর্থনীতিবিদ্ ও বিজ্ঞানী আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে উক্ত কন্‌ভেনশনে বক্তব্য রাখেন। এই সময় "পরমাণু বিদ্যুৎ নয়, চাই বিকল্প"—এই শিরোনামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরমাণু বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের এই বর্তমান প্রয়াস।

পাঠকদের মূল্যবান মতামত আমাদের প্রয়াসকে আরও সংহত করবে।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে সময়ানুগ সহযোগিতা করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। অত্যধিক দ্রুততায় মুদ্রণে সহায়তা করেছেন 'বর্ণায়ন'-এর বন্ধুরা।

তবুও কিছু ত্রুটি থেকে গেল। পাঠকরা নিশ্চয়ই অবুঝ হবেন না।

শব্দ পরিচয়

ভারীজল : হাইড্রোজেনের তিন রকম আইসোটোপ আছে। যথা, $_1H^1$, $_1H^2$, $_1H^3$,। $_1H^2$ কে ডয়টোরিয়াম ও $_1H^3$ কে ট্রিটিয়াম নামে ডাকা হয়। জল এমন একটি তরল যৌগ যা হাইড্রজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরী হয়। যে জলে $_1H^1$ এর বদলে $_1H^2$ বা ডয়টোরিয়াম থাকে তাকে ভারী জল বলে।

আয়ন : ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎবাহী কণিকা এবং প্রোটন ধনাত্মক তডিৎবাহী কণিকা। কোন কারণে যদি এক বা একাধিক ইলেকট্রন কোন পরমাণু থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সেই পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যা থেকে বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পরমাণুটিকে ধ্বনাত্মক আয়ন বলা হয়। বিপরীতে যদি কোন পরমাণু কারো থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন ধরে তাহলে তার ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যা থেকে বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ওই পরমাণুটিকে ঋণাত্মক আয়ন বলে।

আয়নাইজিং রেডিয়েশন : বাংলা অর্থ আয়নীকারক বিকিরণ। যে বিকিরণ বা রশ্মি কোন অজৈব বা জৈব বস্তুর উপর পরলে বস্তুর পরমাণু আয়নে পরিণত হয় তাকে আয়নইজিং রেডিয়েশন বলে। যেমন X-রশ্মি, আলট্রাভায়েলেট (UV) রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি ইত্যাদি।

তেজস্ক্রিয়তা : যে সব পরমাণুর কেন্দ্রে সাধারণত প্রোটনের সংখ্যার চাইতে নিউট্রনের সংখ্যা বেশী তাদের কেন্দ্রগুলিতে সর্বদাই নানা ধরণের বিক্রিয়া চলে এবং এর ফলে এই সব পরমাণুর কেন্দ্র থেকে সর্বদাই কিছু কণিকা এবং রশ্মি নির্গত হয়। এগুলিকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলে। এই রশ্মি তিন রকমের হতে পারে। যথা, আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। তেজস্ক্রিয়রশ্মি মাত্রেই আয়নীকারক বিকিরণ।

ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর : কোন উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা, ধার্য উৎপাদনের শতকরা যতভাগ তাকে ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর বলা হয়।

PJ : পিকো জুল। এক পিকো = 10^{-12}। 4.2 ক্যালরি তাপকে পুরোপুরি কার্যশক্তিতে পরিণত করলে যে শক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ এক জুল। অতএব এক PJ = এক জুলের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ।

মৌলিক পদার্থ : যে সব পদার্থকে ভৌত বা রাসায়নিক কোন উপায়ে বিশ্লেষণ করলে অন্য কোন নতুন পদার্থ পাওয়া যায় না তাদেরকে মৌলিক পদার্থ বলে। পৃথিবীতে মোট 92 টি প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ আছে। বিজ্ঞানীরা

ইতিমধ্যে আরও 13 টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। লেখার সুবিধার জন্য সাধারণত প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের ইংরাজী নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করা হয়। যেমন হাইড্রোজেন—H, অক্সিজেন—O, নাইট্রোজেন—N, ইউরেনিয়াম—U এবং প্লুটোনিয়াম—Pu।

পরমাণু : কোন মৌলিক পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে এমন ক্ষুদ্রতম কণিকা তৈরী হয় যাকে আবার ভাঙলে ওই মৌলিক পদার্থের কোন বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে পরমাণু বলে। পরমাণুকে ভাঙলে সাধারণত তিন রকমের মৌল কণিকা পাওয়া যায়। যথা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা পরমাণুর কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াস) থাকে এবং ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘোরে। কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। এই সংখ্যাটিকেই বলা হয় মৌলিক পদার্থের পরমাণু সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক। যেমন ধরা যাক, U-এর পরমাণু সংখ্যা 92। এর অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন U-এর পরমাণুতে 92টি ইলেক্ট্রন ও 92টি প্রোটন থাকে।

ভরসংখ্যা : যে কোন মৌলিক পদার্থের কোন পরমাণুর প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফলকে ভর সংখ্যা বলে। কোন মৌলিক পদার্থের সংকেতের নীচে লেখা হয় পরমাণু সংখ্যা ও উপরে ভরসংখ্যা। ধরা যাক্ Uএর কোন পরমাণুর পরমাণু-সংখ্যা 92এবং নিউট্রনের সংখ্যা 143। একে তখন লেখা হবে $_{92}U^{235}$।

আইসোটোপ : কোন মৌলিক পদার্থের যে কোন পরমাণুতে পরমাণু সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে অর্থাৎ ভরসংখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। একই পরমাণু সংখ্যা অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভরসংখ্যা বিশিষ্ট পরমাণুগুলির একটিকে অপরটির আইসোটোপ বলা হয়। যেমন তিনরকমের ইউরেনিয়াম পরমাণু। যথা $_{92}U^{233}$, $_{92}U^{235}$ ও $_{92}U^{238}$।

CSIR - Council of Scientific and Industrial Research.
DAE - Department of Atomic Energy.
DRDO - Defence Research and Development Organisation.
ICAR - Indian Council of Agricultural Research.
ICMR - Indian Council of Medical Research.
DST - Department of Science and Technology.
DOS - Department of Space.
DOE - Department of Electronics.
DOEN - Department of Environment.

DOD - Department of Ocean Development.
DNES - Department of Non-Conventional Energy.
TAPS - Tarapur Atomic Power Station.
RAPS - Rajasthan Atomic Power Station.
BWR - Boiling Water Reactor.
CANDU - Canadian Deuterium Uranium.
KWH - Kilo Watt Hour.

ফিসন : বাংলা অর্থ বিভাজন। বিভাজন এমন এক প্রকার কেন্দ্রীন বিক্রিয়া যাতে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে দু'টি বা কখন তিনটি ভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

ফিউসন : বাংলা অর্থ সংযোজন। সংযোজন এমন এক প্রকার কেন্দ্রীন বিক্রিয়া যাতে দু'টি ভিন্ন বা একই পরমাণুর নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

DNA : অ্যাডেনাইন A, সাইটোসাইন S, গুয়ানিন G ও থায়ামাইন T চার ধরণের জৈব ক্ষরীয় যৌগ। এর যে কোন একটি যৌগের অনু অপর আর একটি ফসফেট অনু এবং একটি ডি-অক্সিরিবোস সুগারের অনুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিওটাইড গঠন করে। দুটি এরকম নিউক্লিওটাইড হাইড্রোজেন পরমাণুর মাধ্যমে যুক্ত হ'য়ে প্রথমে জোড়া নিউক্লিওটাইড তৈরী হয়। পরে অসংখ্য জোড়া নিউক্লিওটাইড দু'পাশেই কার্বণ পরমাণুর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে DNA বা ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের একটি অনু গঠন করে। DNA এর কোন নির্দিষ্ট ভর নেই। এর ভর নির্ভর করে কতগুলি জোড়া নিউক্লিওটাইড একত্র যুক্ত হোল তার উপর। দুটো সুতো একত্র পাক দিয়ে পেচালে যেমন হয় DNA কে দেখতে তেমন।

RNA : পুরো নাম রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। প্রায় DNA এর মতই গঠন, পার্থক্য দু'টি জায়গায়। থায়ামাইনের পরিবর্তে ইউরাসিল নামে একটি যৌগ থাকে এবং এখানে রিবোস সুগার থাকে। একে দেখতে একটি সুতোর মত।

TNT : ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন। একটি বিস্ফোরক জৈব যৌগ। এর পরিমাণের সমতুল্যে অন্য যৌগের বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়।

পোখরান ও তারপর

- ১৯৭৪ এর ১৮ই মে-র পর ১৯৯৮ এর ১১ই ও ১৩ই মে। এবারের স্থানও রাজস্থানের পোখরান। দুদিনে মোট পাঁচটি পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। প্রথম দিন তিনটি — একটি ১৫ কিলোটন টি.এন.টি. ক্ষমতার ফিসন বোমা, একটা কম ক্ষমতাসম্পন্ন (০.২ কিলোটন টি.এন.টি) ফিসন বোমা ও ৪৫ কিলোটন টি.এন.টি ক্ষমতার হাইড্রোজেন বোমা। দ্বিতীয় দিন দুটি—০.২ থেকে ০.৬ কিলোটন টি.এন.টি ক্ষমতার ফিসন বোমা। "পরমাণু অস্ত্র প্রয়োজনে যত ধরনের বহুমুখী বোমা বিস্ফোরণের প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ"— ডঃ চিদাম্বরম (সচিব, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি) ও ডঃ এ.পি.যে. কালাম (প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা)।
- "আজ বিকেলে ভারত পর পর তিনটি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তৃতীয়টি হাইড্রোজেন বোমা। ফলাফল আশানুরূপই হয়েছে। যে সব বিজ্ঞানী এই সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি"—প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।
- "নিরস্ত্রীকরণের দিকেই আর একটি পদক্ষেপ"—রাষ্ট্রপতি।
- ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানের প্রশংসা করল সি.পি.আই. ও সি.পি.এম.।
- "সরকা[illegible] শাসনে ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতেই এই বিস্ফোরণ"—ফরয়ার্ড ব্লক।
- "জাতীয় [illegible] দিন"—আই. কে. গুজরাল।
- অগ্নি-২ [illegible] তৈরী করছে ভারত। পাল্লা ২২০০ কিমি। লক্ষ্য, ২০০০ সালের মধ্যে ২০টি ক্ষেপনাস্ত্র তৈরী করা— ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা বিকাশ সংগঠন (DRDO)।
- কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে ভারতকে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপানসহ সাত দেশের রাষ্ট্রনায়ককে প্রধানমন্ত্রীর পত্র।
- "পোখরানে 'শক্তিপীঠ' গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে"—অশোক সিংঘল।
- "পরমাণু" অস্ত্র এবার তুলে দেওয়া হবে ফৌজের হাতে"—প্রতিরক্ষামন্ত্রী।
- প্রতিরক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন, প্রত্যাশিতভাবে সেটাই সরকারের লাইন—প্রমোদ মহাজন।
- আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপাল আমেরিকা, সঙ্গে জাপান।
- বিশ্বব্যাঙ্ক আটকে দিল ৮৬ কোটি ডলার।
- "চিনকে নিয়েই আমরা উদ্বিগ্ন বেশী"—আডবানী
- "ভারতবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য আগে পাকিস্তানকে বোঝানো দরকার। কিন্তু তারা বুঝতে না চাইলে ইসলামাবাদের উপর হামলা করা হোক। দরকার হলে ফেলা হোক হাইড্রোজেন বোমা"—সম্পাদক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।
- ৮০ হাজার কোটি টাকা মার্কিন লগ্নি বাতিল।

- ডলার-হারে টাকার দর তলানিতে।
- জি-৮ বৈঠকে ভারতবিরোধী নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে না।
- পোখরানের জবাব দিতে ব্যর্থ শরিফের ইস্তফা দাবী করলেন বেনজির।
- "আগেই আক্রমণ করুক পাকিস্তান"—বেনজির।
- "ইসলামাবাদকে বুঝতে হবে যে এই উপমহাদেশের এবং গোটা পৃথিবীর ভূ-রণনৈতিক পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে"—আডবানী।
- ২৮ ও ২৯শে মে, '৯৮ : পোখরানের জবাব বালুচিস্থানে। পাকিস্তান বিস্ফোরণ ঘটালো ৭টি পরমাণু বোমার। সম্ভাব্য ক্ষমতা ৫ থেকে ২০ কিলোটনের মতো। হাইড্রোজেন বোমা নেই।
- বোমার মূল্য দিতে দেশবাসীকে দারিদ্র বরণের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান পাক প্রধানমন্ত্রীর।
- পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও মার্কিন আর্থিক অবরোধ।
- "এখন ঐক্যের সময়। ভারত যে এককাট্টা এই বার্তাটা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত"—শারদ পাওয়ার।
- "ভারতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গর্বের মুহূর্তকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে বি.জে.পি."—সনিয়া গান্ধী।
- "বিজ্ঞান চর্চার স্বার্থে জরুরী ছিল বিস্ফোরণ"—রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ।
- এনরণ, ইউনিয়ন কার্বাইড ও অন্য বহুজাতিক সংস্থার কাছে ভারতে লগ্নীর আবেদন ভারত সরকারের ।
- উগ্রজাতীয়তাবাদ এবং পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং, কনভেনশান....

শান্তির জন্য পরমাণু!

পরমাণু বিজ্ঞান বয়সে খুব প্রবীন হলেও পরমাণু প্রযুক্তি একেবারেই হাল আমলের। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ডের একটি ছোট্ট গবেষণা পরমাণুকে একেবারে বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তিতে উত্তোরণ ঘটিয়ে দিল। তিনি আলফা রশ্মি দিয়ে সজোরে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করে দেখলেন নাইট্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আবিষ্কারটি পরমাণু গবেষণায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রযুক্তি হিসাবে খুব একটা কদর পেলনা। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল পরমাণুর কেন্দ্রীনে ভাঙাগড়ার কাজ চালানো সম্ভব। এরপর খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। মাত্র ১৯ বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান ও স্ট্রাসম্যান গতিশীল নিউট্রন কণিকা দিয়ে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর পরমাণুকে আঘাত করে এক অদ্ভুত ফলাফল লক্ষ্য করলেন। একটি নিউট্রনের আঘাতে একটি U^{235} পরমাণু ভেঙে গিয়ে দুটি ভিন্ন মৌলের (বেরিয়াম ও ক্রিপটন) কেন্দ্রীনে পরিণত হচ্ছে এবং এর সঙ্গে তৈরী হচ্ছে প্রচুর শক্তি ও তিনটি গতিশীল নিউট্রন কণিকা যা আবার একইভাবে তিনটি U^{235} পরমাণুকে আঘাত করে। রাদারফোর্ডের কৃত্রিম মৌলান্তর যদি অক্ষরিক অর্থে পরমাণু প্রযুক্তির শুরু হিসেবে চিহ্নিত হয় তাহলে অটোহান ও স্ট্রাসম্যানের আবিষ্কার পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহারিক সূত্রপাত।

ইউরেনিয়াম নিয়ে অটোহান ও স্ট্রাসম্যানের আবিষ্কার অনেক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেও এই প্রযুক্তির ব্যবহারের সামনে তখনও অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। নিউট্রন দিয়ে U^{235} এর একটি পরমাণুকে আঘাত করলে U-পরমাণু বিভাজনের ফলে প্রায় 32PJ শক্তি উৎপন্ন হয়। এবার ব্যাপারটা যদি একতাল U^{235} নিয়ে করা হয় তাহলে কী ঘটবে? একটি নিউট্রন দিয়ে কাজটা প্রথম শুরু করলে প্রথম বার একটি U^{235} পরমাণু ভাঙবে, দ্বিতীয়বার তিনটি, তৃতীয়বার নয়টি, চতুর্থবার সাতাশটি.......। এইভাবে ৭৫ বার অতিক্রম করলেই যতগুলি U^{235} পরমাণু ভাঙবে তাদের একত্র ওজন প্রায় এক কেজি-এর কাছাকাছি। ভাঙতে সময় লাগবে এক সেকেন্ডর কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র এবং উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে 29×10^{13} ক্যালরি। আরও সহজভাবে বললে বলতে হয় এই শক্তি দিয়ে সারে চার কোটি কিলোগ্রাম $0°C$ তাপমাত্রার বরফকে নিমেষে বাষ্পে পরিণত করা যায়। এই বিপুল পরিমাণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত উপযুক্ত যান্ত্রিক পদ্ধতি তখন ছিল খুবই জরুরী। এরজন্য একেবারেই অপেক্ষা করতে হয়নি। পরমাণু বিভাজন বিক্রিয়া আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এনারিকো ফের্মি এমন এক ধরণের চুল্লী তৈরী করেন যার মধ্যে বিভাজন বিক্রিয়া চালালে উৎপন্ন তাপশক্তিকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই চুল্লীই রিয়াক্টার নামে পরিচিত।

গবেষণাগার থেকে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে

আধুনিক পৃথিবীতে বহু অসামরিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু সূতিকাগার থেকে এভাবে টেনে নিয়ে কোন অসামরিক প্রযুক্তিকে সরাসরি যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়েছে খুব

কমই। বিংশ শতাব্দির শুরুতে অসংখ্য বিজ্ঞানীর কাছে তাঁদের গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বস্তুজগতের রহস্যকে আরও বেশী বেশী করে জানা। কৃত্রিম মৌলান্তর ও বিভাজন (Fission) বিক্রিয়াকেও অনেকে তাই মনে করতেন। কিন্তু বাধ সাধলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সমরনায়করা। সমরনায়করা গবেষণার 'গ' না বুঝলেও কোন্ গবেষণার কতটুকু সামরিক সম্ভাবনা তারা তা বিজ্ঞানীদের চাইতেও ভাল বোঝেন। তবে পরমাণু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক আবিশ্বাসও একটি বড় মাত্রা যোগ করেছিল। পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের সঙ্গে যুক্ত আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড, জিলার্ড, ফের্মি, নীলস্ বোর প্রমুখ বিজ্ঞানীরা মিত্রশক্তিভূক্ত দেশগুলিতে অবস্থান করলেও, অটোহান হাইজেন বার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জার্মানেই অবস্থান করতেন। অবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল এটাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ এগোতে শুরু করলে জার্মান সমরনায়ক হিটলার তার ফ্যাসিবাদী চেহারাটাকে এমনভাবে মেলে ধরল যে দীর্ঘদিনের সাথী অটোহান ও হাইজেনবার্গকে অবিশ্বাস করতে আইনস্টাইন, জিলার্ড, ফের্মিদের বেশী সময় লাগল না। তাঁরা ক্রমশ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন হিটলারের প্রবল চাপে নিশ্চিত অটোহান-হাইজেনবার্গরা পরমাণু বোমা তৈরীর কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা ঠিক হিটলারের প্রবল তাপে অটোহান ও হাইজেনবার্গ পরমাণু বোমা তৈরীর জন্য প্রকল্প গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ওঁরা হিটলারের মৃত্যুর প্রায় শেষদিন পর্যন্ত হিটলারকে শুধুই জানিয়েছিলেন বোমার কাজ এগোচ্ছে। কার্যতঃ ওঁরা মানবসভ্যতার আগামীদিনের কথা ভেবে প্রকল্পের কোন কাজ না করে সচেতনভাবেই প্রকল্পটিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। আইনস্টাইনরা প্রকল্পের কথা জানলেও অটোহানও হাইজেনবার্গের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেননি। যদি পারতেন তাহলে হয়ত আজ এই প্রবন্ধ লিখতে হোত না। যাইহোক, আইনস্টাইনদের অবিশ্বাস তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনকে এক বড় সুযোগ করে দিয়েছে পরমাণু প্রযুক্তিকে সরাসরি পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে লাগাতে। এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত। ম্যানহাটান প্রজেক্ট—পরমাণু বোমা তৈরী—১৬ই জুলাই, '৪৫ প্রথম আত্মপ্রকাশ—৬ই ও ৯ই আগস্ট যথাক্রমে হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমার প্রথম বিস্ফোরণ।

পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ সত্যিই কি প্রয়োজন ছিল?

বলাই বাহুল্য, জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের কোন সামরিক তাৎপর্য অর্থাৎ যুদ্ধ জয়ের জন্য কোন প্রয়োজন যে আদৌ ছিল না তা আজ স্ফটিকের মত পরিষ্কার। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবাহী রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল সুগভীর। অক্ষশক্তিভুক্ত অন্যতম দেশ জার্মানী ৭ই মে আত্মসমর্পন করেছে ও দ্বিতীয় আর এক দেশ ইতালী আগেই ভেঙে পড়েছে। অবশিষ্ট তৃতীয় অন্যতম শক্তি জাপান তখনও যুদ্ধরত থাকলেও আত্মসমর্পনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় যদি কেউ এই বলে সাফাই গাইতে চায় যে, জাপানকে আত্মসমর্পনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল তাহলে তা অতিবড় যুদ্ধোন্মাদের পক্ষেও বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিভিন্ন

দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক চুক্তিতে নিজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে নতুন মাত্রা প্রদান এবং সর্বোপরি মানুষ ও পরিবেশের উপর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের যাবতীয় প্রভাব পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে যে মার্কিন যুক্তরষ্ট্র হিরোসিমা-নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তা পরবর্ত্তীকালে USA এর আচরণ থেকেই স্পষ্ট। হায়রে হিরোসিমা-নাগাসাকির হতভাগ্য নিরীহ মানুষ! পরমাণু বোমা বিস্ফোরণজাত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানার স্বার্থে তোমাদের অজ্ঞাতেই তোমাদের বানানো হয়েছিল গিনিপিগ।

এক চোখে অশ্রু, অপর চোখে বাঁকা হাসি

৬ই ও ৯ই আগস্টের ধ্বংসলীলা সারা পৃথিবীর মানুষকে শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সারা পৃথিবীর মানুষের ঘৃণা, ক্ষোভ ও ধিক্কার ক্ষণিকের জন্য হলেও তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনকে ভাবতে বাধ্য করেছিল পরমাণু অস্ত্রসম্ভার এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই কিছু ঢাল বা আড়াল চাই। এই আড়াল তৈরীর প্রথমিক কাজটাও তৈরী করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। হিরোসিমা-নাগাসাকির ঘটনায় বিমর্ষ বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলেন—পরমাণু শক্তিকে ধ্বংসের কাজে নয়, মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। একথা ঠিকই আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পরমাণু-শক্তিকে যে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তা বলার মত যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল না। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন চেষ্টা করলে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এসব কথা না বললেও হয়ত মার্কিন প্রশাসন শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলত। তবে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করাতে মার্কিন প্রশাসনের মুখে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিশ্বের দরবারে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বা USA নিজে কতটা সফল হবে সে বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের আদৌ কোন মাথাব্যথা ছিল না। ওদের মাথাব্যথার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরমাণু অস্ত্রের বিকাশকে অব্যাহত রাখা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ যতটা সম্ভব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ঘাড় মটকে তুলে নেওয়া। ১৯৪৬ থেকে মার্কিন প্রশাসনের পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করলে বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

রিয়াক্টর চালিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রায় একই সাথে USA, USSR, UK এবং ফ্রান্সে শুরু হয় ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে। কিন্তু রপ্তানীর জন্য রিয়াক্টর প্রস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ থেকেই শুরু হয়ে যায়। প্রথমদিকে প্রায় ২০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এই কাজ শুরু করে। যদিও কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। অবশিষ্ট চারটির মধ্যে জোনারেল ইলেক্ট্রিক এবং ওয়েস্টিংহাউস পরবর্তীকালে রিয়াক্টর রপ্তানীতে রীতিমত দু'টি দৈত্যাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পৃথিবীতে প্রথম রিয়াক্টর রপ্তানী শুরু করে USA এর ওয়েস্টিংহাউস ১৯৫৭ সালে বেলজিয়ামকে ১১MWe সম্পন্ন একটি রিয়াক্টর সরবরাহের মাধ্যমে। এরপর '৭৩ সাল পর্যন্ত

সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৫৮টি রিয়াক্টর রপ্তানীর ঘটনা ঘটেছে। বলাবাহুল্য, এর মধ্যে ৪৬টি রপ্তানী করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অতএব বোঝাই যাচ্ছে রিয়াক্টর রপ্তানী ব্যবসার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত সুপরিকল্পিত ভাবে একেবারে গোড়াতেই তার পরিকাঠামোটি তৈরী করেছে। পাশাপাশি এর সাথে সঙ্গতি রেখে USA-এর আইনী ও কূটনৈতিক প্রয়াসও লক্ষণীয়। ১৯৪৬ সালে USA তে ম্যাকমোহন আইন প্রণীত হয় এবং এই আইনের সুবাদেই USAতে পরমাণু শক্তি কমিশন (AEC) তৈরী হয়। ম্যাকমোহন আইনের মর্মবস্তু অনুযায়ী পরমাণু অস্ত্র নিয়ে গবেষণা থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণাকে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব, অন্তত সেই সময়ে এবং এজন্য দুটি বিষয়কেই সরকারী গোপনীয়তার বেড়াজালে আটকে রাখা হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে এই অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে কূটনৈতিক প্রয়াস চালাতেও তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসঙেঘর সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনআওয়ারের বিবৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিবৃতির পুরো অংশ জুড়েই ছিল পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আগামী দিনের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ।

বলাবাহুল্য, মার্কিন প্রশাসনের এই কর্মকান্ডের জন্য সে দেশের পরমাণু অস্ত্রের বিকাশ এক মুহূর্তের জন্য থেমে থাকেনি। আইজেনআওয়ার যখন '৫৩ সালে রাষ্ট্রসঙেঘ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তারই নির্দেশে USA এর নেভাদা প্রদেশে চলছিল পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের মহড়া। মহড়া মানে একটি/দুটি বোমার বিস্ফোরণ নয়। '৫১ সাল থেকে '৫৮ সাল পর্যন্ত সাতটি পর্যায়ে নেভাদার বায়ুমন্ডলে USAEC প্রায় একশ পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের মহড়া চালিয়েছিল।

বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো

আমরা পূর্বেই U^{235}এর কথা উল্লেখ করেছি। এছাড়া আরও দু'ধরনের বিভাজনক্ষম পরমাণু আছে। যথা, ইউরেনিয়াম-২৩৩ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯। এখন পর্যন্ত এই তিন ধরণের পরমাণুর কথাই মানুষের জানা যার সাহায্যে পরমাণু বোমা তৈরী করা যায়। তবে U^{233} দিয়ে এখনও কোন বোমা বানানোর খবর শোনা যায়নি। U^{233}, U^{235} এবং Pu^{239} এর মধ্যে প্রকৃতিতে একমাত্র U^{235} কে পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম খনিতে আর এক ধরণের ইউরেনিয়াম পরমাণুর (U^{238}) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় U^{235} পাওয়া যায়। বলে নেওয়া ভাল U^{238} বিভাজনক্ষম নয়। মিশ্রণে U^{235} এর পরিমাণ মাত্র ০.৭ শতাংশ অর্থাৎ এক হাজার গ্রাম মিশ্রণে U^{238} এর পরিমাণ মাত্র সাত গ্রাম এবং অবশিষ্ট ৯৯৩ গ্রাম U^{238}। এই অবস্থায় U^{235} কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে দু-চারটে পরমাণু ভাঙতে পারে ঠিকই, কিন্তু শৃংখল বিক্রিয়া হবে না অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র মুহূর্তে অসংখ্য U^{235} পরমাণু পরপর ভাঙবে না। এর কারণ বোঝা খুব অসাধ্য নয়। U^{238} পরমাণুর বাধা হিসাবে কাজ করার সুযোগ অনেক বেশী। এই বাধা দূর করতে হলে মিশ্রণে U[illegible] এর ভাগ [illegible] তে হবে। রিয়াক্টরে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিক্রিয়া চালাতে হলে মিশ্রণে U^{235} এর পরিমাণ বাড়িয়ে কম করে ৩% - ৪% করতে হবে অর্থাৎ

প্রতি এক হাজার গ্রাম মিশ্রণে U^{235} এর পরিমাণ হবে ৩০-৪০ গ্রাম এবং U^{238} এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৬০-৯৭০ গ্রাম। U^{235} এর পরমাণু বোমা বানাতে হলে কিন্তু এই ভাগে চলবে না। এখানে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য U^{238} এর বাধা আরও অনেক বেশী। এর জন্য মিশ্রণে U^{235} এর ভাগ বাড়িয়ে প্রায় ৫০% করতে হবে অর্থাৎ অর্দ্ধেক U^{235} এবং বাকী অর্দ্ধেক U^{238}। এই ভাগ বাড়ানোটা মোটেই সহজ কাজ নয়। রিয়াক্টরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যদিওবা U^{235} এর ৩-৪% সমৃদ্ধিকরণ সম্ভব, ৫০% সমৃদ্ধিকরণ প্রায় সম্ভব নয় বললেই ভাল হয়। যুক্তির খাতিরে না বলা যাবে না ঠিকই, কিন্তু ৫০% সমৃদ্ধিকরণ এত বিপুল খরচ ও সময় সাপেক্ষ যে বহন করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাহলে বোমা হবে কি দিয়ে? পরমাণু বোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় সবচাইতে সহজলভ্য উপাদান Pu^{239}। Pu^{239} কে পৃথিবীর কোথাও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়না তা আগেই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এটাকে কৃত্রিম ভাবে আবিষ্কার করেছেন। রিয়াক্টরের মধ্যে খুব সহজেই এটাকে তৈরী করা যায়। U^{235} এর ভাঙনের ফলে যে মুক্ত নিউট্রন তৈরী হয় তা সব সময় যে দেখেশুনে U^{235} কেই আঘাত করবে তা নাও হতে পারে। কখনও কখনও U^{238} কেও আঘাত করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এক পর্যায়ে যখন U^{235} এর পরমাণুর সংখ্যা একেবারে কমে যাবে তখন অসংখ্য 'মুক্ত নিউট্রন' U^{238} কে আঘাত করবে। U^{238} কে নিউট্রন আঘাত করলে U^{238} তাকে একেবারে হজম করে ফেলবে এবং তার ভর বেড়ে হবে U^{239}। এরপর U^{239} এর নিউক্লিয়াস খুব চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং ঝটপট দুটো বিটা কণিকা ছেড়ে দেবে। দুটো বিটা কণিকা ছেড়ে দেওয়া মানে প্রোটনের সংখ্যা দুটো বেড়ে যাওয়া, অর্থাৎ আর ইউরেনিয়াম পরমাণু থাকছে না। এখন পরমাণুর ক্রমাঙ্ক দাঁড়াচ্ছে ৯৪ এবং ভরসংখ্যা ২৩৯। এটাই প্লুটোনিয়াম। রিয়াক্টরে উৎপন্ন এই প্লুটোনিয়ামকে পৃথক করাও খুব সহজ। অতএব U^{235} এর ৩-৪% সমৃদ্ধিকরণ কোন রকমে ঘটিয়ে একবার রিয়াক্টরে ভরতে পারলেই হোল। পরমাণু বোমার জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যাবে।

হ্যাঁ। পৃথিবীতে প্রথম রিয়াক্টরটি তৈরী হয়েছিল প্লুটোনিয়াম তৈরীর জন্যই, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নয়। ম্যানহাটান প্রজেক্টের রিয়াক্টরে উৎপন্ন প্লুটোনিয়াম দিয়ে তৈরী পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল নাগাসাকিতে। অবশ্য হিরোসিমার বোমাটি ছিল U^{235} দিয়ে তৈরী। ইংল্যান্ডের প্রথম বাণিজ্যিক রিয়াক্টর তৈরী হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্লুটোনিয়াম তৈরী, বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। শুধু USA এবং UK নয়, পরমাণু অস্ত্র তৈরী যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য তারা প্রত্যেকেই (USSR, ফ্রান্স ও চীনে) রিয়াক্টর তৈরী করেছিল প্রথমে প্লুটোনিয়ামের জন্য, বিদ্যুতের জন্য নয়।

যাইহোক, একথা পরিষ্কার রিয়াক্টর থাকলেই—যদি মুখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ও—প্লুটোনিয়াম তৈরী হবেই। একটি ২০০-২৫০ MWe ক্ষমতাসম্পন্ন রিয়াক্টর সারা বছর যদি চালু থাকে তাহলে একটি রিয়াক্টর থেকে বছরে প্রায় ৫০০-৬০০ পাউন্ড প্লুটোনিয়াম পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য, কোন রিয়াক্টরই সারা বছর চালু থাকে না। গড়ে একটি রিয়াক্টরের ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর (CF) ৩০-৪০% এর বেশী কখনই পৌঁছায় না। অতএব প্লুটোনিয়াম তৈরী হতে পারে ন্যুনপক্ষে একশ পাউন্ড যা দিয়ে সহজেই কয়েকটি পরমাণু বোমা তৈরী করা যায়।

রিয়াক্টর রপ্তানী ব্যবসাতে নামার আগে মার্কিন প্রশাসনের এ ব্যাপারটা জানা ছিল না তা নয়। USA ভাল করেই জানত আজ যারা রিয়াক্টর আমদানী করছে তারা ভবিষ্যতে এক সময় পরমাণু বোমা তৈরী করতেই পারে। তবে সময়টা কত লাগবে? তৎকালীন USSR সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের একটা ধারণার কথা বলা যাক। USA ভাল করেই জানত USSR বোমা বানাবেই, তবে অন্তত কুড়ি বছরের আগে নয়। USA এর এই ধারণা পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। USSR ১৯৪৯ সালে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। USA অবশ্য পরবর্তীকালে এই বলে সাফাই গাইতে চেয়েছিল যে ম্যানহাটান প্রোজেক্টের কিছু গোপন নথি যদি USSR হাতে না পেত তাহলে USSR '৪৯ এর মধ্যে পরমাণু বোমা তৈরী করতে পারত না। গোপন নথি পাওয়াতে কাজটা সহজ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু না পেলেও USSR এর আর খুব বেশী সময় লাগত না পরমাণু বোমা তৈরীতে। এতো গেল USSR এর কথা। তাহলে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ সম্পর্কে USA-এর কী ধারনা ছিল? এবিষয়ে কোন তথ্য নেই। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের কাছে বিষয়টা খুব একটা প্রাসঙ্গিকও ছিলনা। তবুও এটা ভাবা খুব অস্বাভাবিক হবে না যে, তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের পক্ষে সময়টা কম করে ৩০ থেকে ৪০ বছর। একমাত্র চীন ও ভারতের কথা বাদ দিলে এই ধারণা খুব অযৌক্তিক নয়। অতএব রিয়াক্টর থাকলেই যে কোন দেশ সুদূর ভবিষ্যতে পরমাণু বোমা বানাতে পারে—এই বিষয়টা মার্কিন্ প্রশাসনের উদ্বেগের তালিকায় ছিল না। মার্কিন প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাজার দখল এবং তার স্বার্থে পরমাণু তথা কৌশলী (Strategic) অস্ত্রে সবচাইতে এগিয়ে থাকা ও যতটা সম্ভব বিভিন্ন দেশে তার প্রসার যাতে ঘটতে না পারে তার জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা। পরবর্তীকালে মার্কিন প্রশাসনের প্রাপ্তিযোগের তালিকায় আর একটি বাড়তি সুযোগ যোগ হয়েছে। প্রত্যেক দেশেই রিয়াক্টরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরবর্ত্তীকালে এক করুণ অভিজ্ঞতায় পরিণতি লাভ করেছে। লাভ দূরের কথা, সীমিত ক্ষতি হলেও এতটা ভাবার ছিল না। রিয়াক্টরকে তুলনা করা যায় সেই গরুর সাথে যে গরু খায় খুব বেশী, মলত্যাগ করে খুব সামান্য, বাচ্চা দেয়না, দুধ দেয়না অথচ মানুষকে গুঁতোয়। রিয়াক্টরে বিদ্যুৎ তৈরীর খরচ অন্যান্য যে কোন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ তৈরীর খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী। এর উপর রয়েছে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় দূষণ যাকে আটকাবার বা নির্বাহ করবার কোন পদ্ধতিই এখন পর্যন্ত নেই। তৃতীয় বিশ্বের কোন অনুন্নত দেশের চলমান অর্থনীতির বারোটা বাজাতে চাইলে অন্য কিছুর দরকার নেই, গোটা কয়েক রিয়াক্টর সে দেশে ঢুকিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। এভাবে দেশে দেশে অর্থনীতির ভাঙন USA-এর বাণিজ্যিক ও সামরিক উভয় স্বার্থকেই সংহত করেছে।

কিল খেয়ে কিল হজম

এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৯টি দেশে রিয়াক্টর ঢুকেছে। এরমধ্যে গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বেশীরভাগ দেশই পরমাণু প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর নয় অর্থাৎ তাদেরকে অন্য দেশ থেকে রিয়াক্টর আমদানী করতে হয়েছে। রিয়াক্টর রপ্তানীকারক দেশ শুধু রিয়াক্টর রপ্তানী করেই ক্ষান্ত থাকেনা। আমদানীকারক দেশের সার্থে এ বিষয়ে আরও কিছু প্রয়োজনীয় চুক্তি হয়। যেমন

(১) রিয়াক্টরের শেষ দিন পর্যন্ত জ্বালানী (সমৃদ্ধ U^{235}) সরবরাহ এবং (২) রিয়াক্টরের মধ্যেকার বর্জ্য পদার্থ থেকে কখনও প্লুটোনিয়াম আহরণ করা চলবে না। প্রথমটি অর্থনৈতিক চুক্তি। তাই বরাবর চালু থাকে। অবশ্য এছাড়া উপায়ও নেই। U^{235} সমৃদ্ধকরণের জন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা পৃথিবীতে খুব কম দেশেরই আছে। সাধারণত যেসব দেশ রিয়াক্টর রপ্তানী করে সেসব দেশেই সমৃদ্ধকরণের প্রযুক্তি চালু থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রযুক্তি কোন দেশই রপ্তানী করে না। যাইহোক, দ্বিতীয় চুক্তিটি নৈতিক। এখানেই কারচুপীর সম্ভাবনা। রিয়াক্টরের বর্জ্য পদার্থের উপর ধারাবাহিক নজরদারী রাখা সম্ভব না। ঠিক এই কারণেই কিল খেয়ে কিল হজম করা। রিয়াক্টর আমদানীকারক বহু দেশের অর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মুখ ফুটে খুব কম দেশই এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। হ্যাঁ, কিছু কিছু দেশ সরকারীভাবে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আসলে এসব দেশের পরমাণু বোমার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। যেমন ধরা যাক ডেনমার্কের কথা। ডেনমার্ক সরকার ১৯৮৫ সালে আইন করে সে দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন নিষিদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে আরও অনেক দেশ ডেনমার্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।

ক্ষুধাতুর ভারতের পরমাণু ভোজ :

স্বাধীনতার পর এক বছর পেরোতে না পেরোতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, নেহরু উপলব্ধি করলেন পরমাণু শক্তি ভারতের চাই...ই। ব্যাপারটা যে তার একার চেষ্টাতেই হয়েছে, তা নয়। তিনি বেশ একজন কেতাদুরস্ত প্রোমোটার ভদ্রলোক পেয়েছিলেন। কেম্ব্রীজে পড়া ও টাটা গোষ্ঠীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই ভদ্রলোকের নাম হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। বস্তুত তার একাগ্র পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৯৪৮ সালে পরমাণু শক্তি কমিশন (AEC) ও তার মাথার উপর একটি পরমাণু শক্তি দপ্তর গঠিত হয়। বর্তমানে এই দপ্তরের অধীনে যা যা আছে তার তালিকাটা এরকম—

(ক) ৭টি রিয়াক্টর, (খ) কয়েকটি পরীক্ষামূলক রিয়াক্টর, (গ) কয়েকটি ভারী জল প্রকল্প, (ঘ) ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC), (ঙ) কেরালায় ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট, (চ) হায়দ্রাবাদে একটি রিপ্রসেসিং সেন্টার এবং (ছ) বিহারের যদুগোড়ায় একটি ইউরেনিয়াম খনি।

এই বিপুলাকার এস্টাবলিশমেন্ট থেকে ভারতীয় জনগণের এখন পর্যন্ত প্রাপ্তি (ক) শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে (?) একটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ, (খ) যুদ্ধাস্ত্রের স্বার্থে চারটি পরমাণু বোমা ও একটি হাইড্রজেন বোমার (থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা) বিস্ফোরণ এবং (গ) কিছু বিদ্যুৎ।

সব মিলিয়ে ১.৩.৯৭ পর্যন্ত এদের আর্থিক মূল্য ছিল ৩৬৬১০ কোটি টাকা। এছাড়াও রয়েছে পরমাণু গবেষণার খরচ। মনে রাখা দরকার সব টাকাটাই ভারতীয় জনগণের শ্রমার্জিত।

Estimated Strength of Department of Atomic Energy.

Year	Rs. in Crore
'91-'92	34635
'92-'93	34926
'93-'94	32863
'94-'95	32647
'95-'96	33726
'96-'97	35905
'97-'98	36610

সূত্র : EPW, May 17-23/24-30, 1997

বোমা এবং বিদ্যুতের মধ্যে এতদিন ভারতসরকার বিদ্যুৎকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে প্রচার করে এসেছে। কিন্তু তথ্য এবং পরিসংখ্যান যতটুকু পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে বিদ্যুৎকে মেনে নেওয়া খুবই শক্ত। প্রথমত রিয়াক্টরেরে ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর (CF) অর্থাৎ ধার্যক্ষমতার শতাংশ হিসাবে উৎপাদন ক্ষমতার হার খুবই কম। পরমাণুশক্তি ভক্তদের দাবী রিয়াক্টরের CF গড়ে ৬০ থেকে ৬২ শতাংশ। কালে-ভদ্রে বা এক আধ বছরের জন্য এটা হতে পারে। কিন্তু একটা রিয়াক্টরের পুরো জীবনকালে এটা কখনই হতে পারে না। পুরো জীবনকালে এই গড় ৩০-৪০ শতাংশের বেশী কখনই নয়। '৬৯-'৭৮ পর্যন্ত TAPS (I & II) এর গড় CF ছিল ৫০ শতাংশ এবং '৭৩-'৭৮ পর্যন্ত RAPS(I) এর গড় CF ছিল ২৬ শতাংশ। অপরদিকে কয়লা বিদ্যুতের CF ৮০ শতাংশ এর নীচে খুব কমই নামে।

Capacity Factor

	'69	'70	'71	'72	'73	'74	'75	'76	'77	'78
TAPS (I&II)	53.4	59.2	48.7	23.6	54.5	37.0	52.9	62.2	61.1	56.8
RAPS-I	—	—	—	—	17.2	36.8	33.2	44.3	26.4	9.2

সূত্র : IAEA (Operating Experience '73 to '80)

দ্বিতীয়তঃ পরমাণু বিদুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ খরচ ও নির্মাণ কাল জল বিদ্যুৎ বা কয়লা বিদ্যুতের চাইতে অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ জ্বালানী সহ অন্যান্য চলমান খরচ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অনেক বেশী। চতুর্থতঃ পরমাণু জ্বালানী কয়লা বা জল বিদ্যুতের মত সহজলভ্য নয়। খনি থেকে আকরিক আহরণ ও রিয়াক্টর এর মধ্যে মোট ছ'টি ধাপে জ্বালানী প্রস্তুত করা হয়। প্রতিটি ধাপই খরচ সাপেক্ষ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণজাত বিপদে পরিপূর্ণ। TAPS-1 ও II, RAPS-I, কয়লা বিদ্যুৎ ও জল বিদ্যুতের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় TAPS এবং RAPS-I এ এক একক বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ যেখানে ১১.৯ ও ১৭.৯ পয়সা সেখানে এক একক জল বিদ্যুতের দাম ৭.৩ পয়সা ও কয়লা বিদ্যুতের দাম ৯.৮ পয়সা।

Cost of Nuclear Power

	TAPS (I&II)	RAPS-I	Hydro	Coal
Fixed cost (Paisa Per Kwh) When CF at 50%	8.2	11.7	7.3	6.4
Fuel cost (Paisa per Kwh)	3.7	2.0	—	3.4
Heavy Water Losses (Paisa per Kwh)	—	3.7	—	—
Total	11.9	17.4	7.3	9.8

Source : Nuclear Power in India, Author — Hart David

পরমাণু বিদুতের খরচ এখানেই শেষ নয়। এর সাথে যুক্ত অন্ততঃ আরও তিনটি বিষয় আছে যেগুলির খরচ মূলত পরমাণু বিদ্যুতের খরচ। AEC সুকৌশলে এগুলি এড়িয়ে যায়। এগুলি যথাক্রমে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের পৃথকীকরণ (Reprocessing) ও নির্বাহীকরণ (Disposal), কর্মক্ষমতা ফুরিয়ে যাওয়া রিয়াক্টরের নির্বাহীকরণ এবং পরমাণু গবেষণা ও উন্নয়ন।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনার পৃথকীকরণ ও নির্বাহীকরণ

আমরা আগেই বলেছি যখন রিয়াক্টরের মধ্যে u^{235} পরমাণু ভাঙার প্রক্রিয়া চলে তখন প্লুটোনিয়াম সহ ২৫০-৩০০ রকমের তেজস্ক্রিয় পরমাণু তৈরী হয়। এদেরকে তাৎক্ষণিক ভাবে তেজস্ক্রিয়তাহীন করার কোন পদ্ধতি এখন পর্যন্ত জানা নেই। অতএব এদের নির্বাহীকরণের একমাত্র উপায় এমনভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যাতে কোন মতেই এরা পরিবেশের সংস্পর্শে আসতে না পারে। সংরক্ষণের উপায় নিয়ে এযাবৎ পরীক্ষা-নীরিক্ষা কম হয়নি। তবুও এখনও পর্যন্ত শতকরা প্রকৃত নিরাপদ সংরক্ষণ পদ্ধতি পৃথিবীতে কোনদেশের হাতেই নেই। পরমাণু বিদ্যুতের প্রথম যুগে এইসব আবর্জনাকে পুরু স্টীলের বাক্সে ভরে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোত। কিছুকাল পরে দেখা গেল বাক্সগুলি লিক্ করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমুদ্রজলে মিশতে শুরু করেছে। পরবর্তীকালে এর বদলে শুরু হোল মাটির গভীরে পুরু কংক্রীটের চেম্বারে তেজস্ক্রিয় পদার্থভর্তী স্টীলের বাক্সগুলিকে কবরস্থ করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হোল এই যে, কবরের মধ্যে পেঁচানো পাইপের মাধ্যমে নিয়মিত ঠান্ডা জলের সরবরাহ বজায় রেখে এই কবরগুলিকে শত শত বা হাজার হাজার বছর পাহারা দিতে হবে। ইদানীং অবশ্য বিকল্প একটি পদ্ধতির কথা জানা যাচ্ছে। তেজস্ক্রিয় আবর্জনাগুলিকে উচ্চতাপে কাঁকের মত পদার্থে পরিণত করে পুরু স্টীল বা সীসার বাক্সে সংরক্ষণ করলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার মিশে যাওয়ার

সুযোগ হ্রাস পায়। এতক্ষণ ধরে যা বলা হোল তা সবই সেই ধরণের তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাদের অর্ধায়ু মাঝারি বা দীর্ঘ। যাদের অর্ধায়ু দুদিন, দশদিন বা একমাস তাদেরকে স্তুপাকারে মাটির উপর ফেলে রাখা হয় এবং বাধাহীন ভাবে এরা তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতেই থাকে। উৎপাদন চালু থাকলে এর কোন বিরাম নেই।

যাইহোক, সংরক্ষণের খরচটা কেমন? বলা ভাল, সঠিক তথ্য জানা নেই। USA-এর একটা ছোট খবর জানা আছে। সেটাই বলি। এক গ্যালন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ওদের কবর দিতে খরচ হোত ২.৫ ডলার। কবর বা সংরক্ষণের খরচ যাই হোক, এদের পাহারা দিতে হবে হাজার বছর। ৩০-৩৫ বছর বিদ্যুৎভোগ করে আমরা আমাদের উত্তর-পুরুষদের জন্য রেখে যাচ্ছি হাজার বছর মেয়াদী খরচের এক বিশাল পাহাড়।

মৃত রিয়াক্টরের নির্বাহীকরণ

একটা রিয়াক্টর ৩৫-৪০ বছর কর্মক্ষম থাকে। এই সময়ের মধ্যে গোটা রিয়াক্টরটি এত তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে যে তেজস্ক্রিয় আবর্জনার মতই এর নির্বাহীকরণের প্রয়োজন। সমস্যাটি এখনও ভাল দানা বাঁধেনি। সবে বাঁধতে শুরু করেছে। ১৯৮০ সালে USA-এর একটি রিয়াক্টরকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তার নির্বাহীকরণের জন্য USAAEC একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরী করে। তারা '৮৪ সালে এরজন্য পরিকল্পনা তৈরী করেন। পরিকল্পনার বিষয়ে এখানে বিশদে যাচ্ছি না। শুধু খরচটার কথা বলি। উপরিউক্ত রিয়াক্টরটি (শিপিংফোর্ট) বসাতে খরচ হয়েছিল ৬০ মিলিয়ন ডলার। বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিকল্পনা রূপায়ণের খরচ ধার্য করেছেন ৮০ মিলিয়ন ডলার। ভারতে TAPS এবং RAPS-এর মৃত্যু ক্রমশই এগিয়ে আসছে। অমরা কেউ জানিনা এদের সৎকার ও শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য কত খরচ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তবে মেয়ে বিয়ের টাকা জমানোর মত রাজা রামান্না (AEC-এর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান) পরবর্তী রিয়াক্টরগুলির জন্য একটা পথ বাত্লেছেন। গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতি একক বিদ্যুৎ পিছু বাড়তি ০.৮৮ পয়সা আদায় করে তা জমিয়ে রাখতে হবে। এই জমা টাকা ভবিষ্যতে রিয়াক্টরের সৎকারে খরচ করা হবে। সৎকারটা কিভাবে করা যাবে সে বিষয়ে অবশ্য রামান্না কিছু বলেননি। হায়রে মহম্মদ বিন তুঘলক! বেঁচে থাকলে তুমিও হাসতে!

পরমাণু গবেষণা ও উন্নয়ন :

প্রতি বছর বাজেটে সামগ্রিক ভাবে গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) জন্য একটা বরাদ্দ থাকে। এই বরাদ্দকে আবার শীর্ষ স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভাগ করার শর্তগুলি কি তা জানা নেই। তবে বাজেটগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রতি বছর AEC গড়ে R & D সংক্রান্ত মোট বাজেটের ২০ শতাংশেরও বেশী আত্মস্যাৎ করেছে।

Indian DAE Budget (Rs. in Million)	
Year	*Budget*
'63-'64	129
'64-'65	259
'65-'66	432
'67-'68	587
'71-'72	1050
'72-'73	1260
'73-'74	1180
'74-'75	1640
'75-'76	1935
'76-'77	2155
'77-'78	2077
'78-'79	2633
'79-'80	2950

সূত্র : DAE Performance Budget, Rao-1974, Kaul-1974. Nuclear Engineering International April-'79(p-9)

DAE R&D Expenditure (Rs. in Million)	
Year	*Budget*
'63-'64	111.5
'64-'65	143.4
'65-'66	200.5
'68-'69	253.7
'69-70	267.8
'70-'71	287.2
'71-'72	206.1
'72-'73	197.3
'73-'74	244.6
'74-75	418.8
'75-'76	539.4
'76-'77	608.8
'77-'78	611.2
'78-'79	609.9

সূত্র: DAE Performace Budget. Nuclear India-Dec'78

Proportion of Indian R&D going to Atomic Energy. (Rs. in Million)

Year	*Total Govt. R&D*	*% of DAE*
'55-'56	121	14.3
'58-'59	277	28.1
'60-'61	299	25.7
'63-'64	487	22.9
'64-'65	586	24.5
'65-'66	791	25.3
'66-'67	881	—
'67-'68	930	—
'68-'69	1110	22.9
'69-'70	1232	21.7
'70-'71	1449	19.8
'72-'73	—	13.2
'73-'74	—	15.1
'74-'75	—	19.5
'75-'76	2500	24.6
'76-'77	3200	19.0

সূত্র : DST (1977) '—' তথ্য অজানা।

আজকের যুগে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতি ও বিকাশের সাথে গবেষণার সম্পর্ক নিবিড় এবং অবশ্যই গবেষণা উৎপাদন খরচের একটি অংশ। উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি ও বিকাশ যদি একটি চলমান প্রক্রিয়া হয় তাহলে বাস্তবিকই গবেষণার খরচটা খুব একটা গায় লাগেনা। কিন্তু AEC এর গবেষণা পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি ও বিকাশে বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে পারেনি। পরমাণু প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে সব বিষয়গুলি আমদানী করা যায়না বা কেউ রপ্তানী করেনা সেগুলিকে আত্মস্থ করার জন্যই মূলত AEC-এর গবেষণা। ফলে AEC-এর পরিকাঠামোগত আকারটাই শুধু বেড়েছে। উল্টোভাবে অর্থ দাঁড়ায় আরও বেশী বেশী করে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যা তৈরীর জন্যই AEC-এর গবেষণা।

সত্যিই পরমাণু-বিদ্যুৎ প্রয়োজন?

১৯৬১ সালে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে কয়লা সম্পদ ও জল বিদ্যুৎ সম্ভাবনাগুলিকে পুরোপুরি কার্যকরী করে তুলতে পারলে সার্বোচ্চহারে ভারতের শিল্পায়নকে সক্ষম করে তুলতে তা যথেষ্ঠ এবং আগামী দশকগুলিতে এটা যৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে।

"Coal reserves together with hydro potential of India, when fully harnessed appeared to be sufficient to enable the industrialisation of the country at the maximum rate that could be considered feasible during the next few decades." (Central Water & Power Commission, 1961, P-2).

ভারতে কয়লার মজুতভান্ডার প্রায় ৮৪ হাজার মিলিয়ন টন এবং জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা আনুমানিক এক লক্ষ মেগাওয়াট। বাস্তবিক এই পরিসংখ্যান কখনও প্রমাণ করে না যে ভারতে বিদ্যুৎ সমস্যা ও তার উত্তরোত্তর চাহিদা মেটানোর জন্য আগামী একশ বছরে অন্য কোন উৎসের কথা ভাবতে হয়।

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎসাহীরা এই যুক্তিকে অস্বীকার করতে না পেরে একটু ভিন্ন পথ ধরেছেন। তাদের বক্তব্য কয়লা এবং জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনাগুলি বেশীরভাগই পূর্বাঞ্চলে এবং উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। অতএব মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য পরমাণু বিদ্যুতের কথা ভাবতেই হয়। এই যুক্তিও ধোপে টেঁকেনা। মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যায় তাপ বিদ্যুতের উপযোগী অন্ততঃ ৩০ বিলিয়ন টন কয়লার মজুতভান্ডার আছে। National Council for Applied Economic Research এর তথ্য (১৯৬২) অনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চলে উপযোগী কয়লা ও লিগ্‌নাইটের মজুতভান্ডারও যথেষ্ট। বরং পরমাণু বিদ্যুতের অজুহাতে DAE এবং AEC এতকাল যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে তা যদি প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উনতিতে, পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির গবেষণায় এবং স্বাস্থ্য ও কৃষি গবেষণায় ব্যবহৃত হোত তাহলে ভারতের চেহারাটাই বদলে যেত। অনেকেই পুনর্নবীকরণ শক্তির কথা শুনলেই ভ্রূ সংকুচিত করেন। পরিমিত বিনিয়োগ সহ গবেষণা ছাড়া কোন উৎপাদন প্রক্রিয়াই সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে না। আশ্চর্য্যের কথা পূনর্নবীকরণ শক্তির গবেষণায় সরকারী বিনিয়োগ শুরুই হয়েছে '৮০-'৮১ সালের বাজেটে মাত্র ৪.৪৪ কোটি টাকা দিয়ে। উল্লেখ্য, সে বছর পরমাণু শক্তি গবেষণায় বরাদ্দ ছিল ৭৩.৪৮ কোটি টাকা। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় বিদ্যুৎ অপচয় হয় গড়ে প্রায় ২২শতাংশ, অর্থাৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১০০MW বিদ্যুৎ তৈরী হলে ভোক্তাদের কাছে যেতে যেতেই 22MW বিদ্যুৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবহন অপচয় কখনই শূন্যে নামানো যাবে না, কিন্তু সামান্য অর্থ বিনিয়োগ এবং উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে খুব সহজেই পরিবহণ অপচয় ১০%-এ নামিয়ে আনা সম্ভব, অর্থাৎ এর ফলে আমরা যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পাব তার পরিমাণ বর্তমান পরমাণু বিদ্যুতের তিনগুনেরও অধিক।

R&D Expenditure by Major Scientific Agencies under the Central Govt
(Rs. In Lacs)

Sl. No.	Orgn. Name	'58-'59	70-71	75-76	78-79	79-'80	'80-'81	'81-'82	'82-'83
1.	DAE	775.88	2871.56	5394.00	6082.32	6781.46	7347.81	8826.06	10563.13
2.	CSIR	509.94	2155.73	3711.00	5592.39	5918.99	6900.00	7877.08	10081.50
3.	DRDO	150.00	1755.35	5217.00	667.61	9662.91	7971.00	10483.36	12199.96
4.	ICAR	372.29	1837.00	3294.00	5603.56	7739.81	9744.67	11149.50	13121.50
5.	ICMR	50.50	217.63	332.00	533.54	598.50	900.11	1195.13	1423.15
6.	DST	22.13	84.18	525.01	2389.83	2603.56	4063.69	4608.01	6051.06
7.	DOS	—	—	3666.80	4553.74	4421.13	5601.56	7503.44	8605.17
8.	DOE	—	—	238.01	511.47	750.25	540.55	751.11	847.55
9.	DOEN	—	—	—	—	—	373.99	546.88	905.77
10.	DOD	—	—	—	—	—	—	788.43	4935.94
11.	DNES	—	—	—	—	—	400.44	989.82	1203.20

সূত্র : Research & Development Statistics, '82-'83, Department of Science & Technology, P-37

অতএব, এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট, ভারত সরকার পরমাণু বিদ্যুৎকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এতকাল পরমাণু অস্ত্রের গবেষণা ও বিকাশই চালিয়ে আসছে। পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলি যেমন রিয়াক্টরকে প্লুটোনিয়ামের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে ভারতও তেমনটাই করেছে।

পরমাণু অস্ত্র ও ভারত

ভারতে AEC-র উদ্দেশ্য যে প্রথম থেকেই পরমাণু অস্ত্রমুখী ছিল তার সমর্থনে অন্ততঃ ৪টি অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। (১) ভারতে একটি পরমাণু শক্তি আইন আছে। এই আইনানুযায়ী AEC-র চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আর এমন কোন সরকারী কর্তাব্যক্তি নেই যিনি AEC-এর যাবতিয় কাজকর্ম ও খরচ-খরচা খতিয়ে দেখতে পারেন। এমনকি CAG ও সব খরচা পরীক্ষা করতে পারেনা। সত্যিই যদি উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ হয় তাহলে এই গোপনীয়তা কার স্বার্থে? মেঘনাদ সাহার মত বিজ্ঞানীও আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

"We are not allowed to talk about atomic energy. The Atomic Energy Commissions never said what they are doing, what researches they are financing. Every thing was under a veil of secrecy."

(২) তারাপুরের রিয়াক্টর দুটি ছিল USA এর General Electric কোম্পানী থেকে আমদানী করা BWR জাতীয়। রাজস্থানের রিয়াক্টর আমদানী করার সময় AEC-র পছন্দ হোল কানাডার CANDU জাতীয় রিয়াক্টর কারণ BWR এর চাইতে CANDU তে ভাল হারে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়। যদি বিদ্যুতই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্লুটোনিয়ামের জন্য এত মাথাব্যথা কেন?

(৩) ভারত সরকার তার উৎপন্ন ও জমা প্লুটোনিয়াম দিয়ে কি করবে—এই প্রশ্ন ইতিপূর্বে বহুবার উঠেছে। AEC একটিই জবাব দিত, তারা ফাস্ট ব্রীডার রিয়াক্টর (FBR) চালু করবে। তখন প্রচুর প্লুটোনিয়াম প্রয়োজন হবে। তত্ত্বগতভাবে FBR চালু করলে বছরে কম করে 1000kg প্লুটোনিয়াম প্রয়োজন। প্রতি বছর 1000kg প্লুটোনিয়াম পেতে হোলে কম করে ২০টি রিয়াক্টর চালু থাকা প্রয়োজন যা ভারতে নেই এবং আগামী কত বছরে তা হতে পারে তাও জানা নেই। দ্বিতীয়ত FBR এখনও কেন পরীক্ষিত বা প্রমাণিত প্রযুক্তি নয়। পৃথিবীতে কোন দেশেই এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে FBR নেই। ভারতে AEC-এর দ্বিতীয় চেয়ারম্যান বিক্রম সারাভাই তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে FBR সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। অতএব পরমাণু বোমা ছাড়া প্লুটোনিয়ামের আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

(৪) পরীক্ষামূলক রিয়াক্টর সাইরাস থেকে প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করে ভারত ১৮ই মে ১৯৭৪ পোখরানে একটি পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সরকারীভাবে এটাকে পরীক্ষা মূলক বিস্ফোরণ না বলে বলা হয়েছে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ। পরমাণু বিস্ফোরণের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কথা একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া আর কেউ কোনদিন বলেছেন বলে জানা নেই। যাই হোক তিনি যখন বলেই ফেলেছেন তখন তার নৈতিক দায়িত্ব

ছিল পরমাণু বিস্ফোরণের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরী করা। তিনি ১৯৮৪ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এরকম কোন পরিকল্পনার কথা শোনা যায়নি। বরং অতি সম্প্রতি A.P.J. আবদুল কালামের কাছ থেকে জানা গেল ১৯৮১-এর মধ্যেই ১১ই ও ১৩ই মে-র বোমাগুলি তৈরী হয়েছিল। পরমাণু বোমা বিস্ফোরনের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভবতঃ শতাব্দির সেরা ধাপ্পা।

এতদিন যা ছিল পর্দার আড়ালে, এখন তা প্রকাশ্যে। অতি সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার BARC ও DRDO কে নিয়ে একটি Complex তৈরী করেছে। লক্ষণীয় যে Complex টি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন কিন্তু DAE-এর অধীন নয়। দীর্ঘকাল ধরে DAE, DRDO ও SO একত্র R & D বাৎসরিক বাজেটের অর্ধেকের বেশী আত্মস্যাৎ করে আসছে। SO এর কাজকর্মও মূলত সামরিক স্বার্থমুখী। অর্থাৎ DAE, DRDO ও SO —এই ত্রয়ী নিজেদের আন্তসম্পর্ক বজায় রেখে এতদিন সামরিক স্বার্থকেই রক্ষা করেছে যার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, ক্ষুধার্ত শীর্ণকায়, অশিক্ষিত, রোগগ্রস্ত ও আশ্রয়হীন মানুষের বড় নিরাপত্তা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা। বন্দুক বা পরমাণু বোমা বা মিশাইল কখনই নয়।

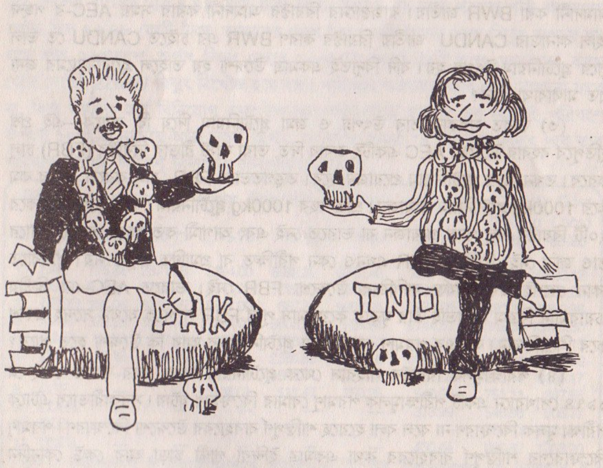

জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব

আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ—মানুষের মধ্যে এই বিস্ময় অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল কমপক্ষে ৪৫৯.৯৯ কোটি সৌর বছর। এরই মধ্যে জন্ম নিয়েছে অফুরন্ত প্রাণ। রাসায়নিক অনুগুলোকে ২০০ কোটি বছরের অনিশ্চয়তায় প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল প্রথম প্রোটিনটি সৃষ্টি করবার জন্য, ৩৯৫ কোটি বছর পর ফুটেছিল একটি ফুলের কুঁড়ি। কোটি কোটি বছরের কোটি কোটি বৈচিত্র্য। চার্লস ডারউইন যে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তার মূলেও ছিল জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তার অপার বিস্ময়। মহাবিশ্ব, সৌরজগৎ, পৃথিবীর রাসায়নিক ও জৈবিক বিবর্তন পরম্পরা এবং পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে মগজে দ্বিগুণ হয়ে ওঠা মানুষের সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আমরা আজ এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যে কম্প্যুটার এর বোতাম টিপে নিমেষের মধ্যে তাবৎ জৈবিক অস্তিত্বকে নিষ্প্রদীপ করে দিতে পারি। বস্তুতঃ জীবনবেরসিক পরমাণু প্রযুক্তি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতেই পারে।

বেশী থেকে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, বিটা রশ্মি ও আলফা রশ্মি—এই রশ্মিগুলিকে আয়োনাইজিং রেডিয়েশান বা আয়োনিকারক বিকিরণ বলে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হয় তার ভেদন ক্ষমতা (Penitrating Power) তত বেশী হয় অর্থাৎ সেই রশ্মি তত বেশী ক্ষতিকর। যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের, প্রাণীদেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির বিকিরণ ঘটে। প্রাণীদেহের ওপর এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) বিকিরণের মাত্রা অত্যধিক হলে সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য প্রতিক্রিয়া ঘটে, (২) মাত্রা কম হলে দেহের মধ্যে তা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অতিদীর্ঘকাল পরে, এমনকি পঞ্চাশ ষাট বছর পরেও তার ক্ষতিকর লক্ষণ ফুটে ওঠে। (৩) প্রাণীদেহে বিকিরণের স্পর্শে তার জীবনকালে কোন বাহ্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু তার জননকোষের ক্ষতি হতে পারে, যার জন্য তার নবজাতকের দেহে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণপ্রবণ কেরলে জন্মগত হার্টের অসুখ, পেশীর বৈকল্য ও অপরিণত মস্তিষ্কের শিশুর জন্মহার বেশী। অর্থাৎ প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা ক্ষতিকর। বস্তুতঃ প্রথমেই উল্লেখিত পৃথিবী সৃষ্টির পর ক্ষুদ্র একটি প্রাণের একক তৈরী হতে কয়েক শত কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা কমতে কমতে যখন প্রাণের পক্ষে সহনশীল মাত্রায় নেমে এসেছে তখনই প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা তৈরী হয়েছে। হায়! প্রকৃতির সবচেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষ, আমরা আমাদের কৃতকর্মের দ্বারা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা একটু একটু করে বাড়িয়ে চলেছি। এতো গেল প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার কথা। তাহলে যারা

সরাসরি তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে কাজ করেন তাদের কী হয়? যে বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় মৌলের সাঙ্গে পৃথিবীর মানুষের পরিচিতি ঘটালেন তারাও রেহাই পাননি এর মারণ বাণ থেকে। উইলিয়ম রঞ্জেন (যিনি এক্স রশ্মি আবিষ্কার করেন)-এর প্রিয় সহকারীর দুটি হাত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়। স্বল্প মাত্রার রশ্মির দীর্ঘকালীন প্রভাবে মাদাম কুরীর (যিনি রেডিয়াম মৌল আবিষ্কার করেন) মৃত্যু হয়। তাঁর কন্যা ইরিন জুলিও কুরীও রক্ত-ক্যানসারে মারা যান। প্রথম মৃত্যু ঘটে ১৯১৪ সালে এমিলিও তিরিবিশি নামে এক রেডিওলজিস্টের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঘড়ির ডায়াল উজ্জ্বল করতে রেডিয়াম ব্যবহারকারী বহু ঘড়ি শ্রমিক রক্তাল্পতা ও হাড়ের ক্যানসারে মারা যান। পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ভিতরে যে শ্রমিকেরা কাজ করেন তাদের পেশাগত অসুখ গোপনীয়তার কারণে প্রকাশ করা হয় না। তবু শোনা যায় তারাপুর পরমাণু কেন্দ্রের ভিতরে মোটা টাকা পেলেও ছ'মাসের বেশী কোন শ্রমিক কাজ করতে পারেন না। ক্যানসার ও চর্মরোগের মত বিবিধ অসুখে তারা আক্রান্ত হন। ছ'মাসের পর তাদের খবর আর কেউ রাখেন না। এই কেন্দ্রের চারিপাশে গাছপালার সংখ্যাও খুব কম। ১৯৮৩ সালে স্যর ডগলাস ব্ল্যাকের অধীনে ইংল্যান্ডের সেলফিল্ড পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে তদন্তের ফলে প্রমাণিত হয়েছে ঐ শক্তিকেন্দ্রের তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সীস্কেল গ্রামের অল্প বয়সীদের মধ্যে লিউকোমিয়া রোগীর সংখ্যা ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের লিউকোমিয়া রোগীর গড় সংখ্যা থেকে বেশী। এসবই সঙ্গদোষে ফলভোগের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি সরাসরি পরিবেশকে আক্রমন করলে কী ঘটতে পারে তার প্রমাণ আজও বহন করছে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি। ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ শহর দুটিতে ছটি পরমাণু বোমা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয় তা অবর্ননীয়। বোমা বিস্ফোরণের সন্নিহিত অঞ্চলে তাৎক্ষনিক যে বিপুল তাপ উৎপন্ন হয় তাতে নিমেষের মধ্যে ওখানকার সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী বাষ্পিভূত হয়ে যায়। তার পার্শ্ববর্তী আরও বেশ কিছু এলাকা জুড়ে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণী আগুনে পুড়ে মারা যায়। এর সঙ্গে ছিল তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব। কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষ যারা উচ্চমাত্রার বিকিরণের শিকার হয় তারা অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। আরও দূরবর্তী এলাকার মানুষ কম বিকিরণের শিকার হয় তারা পরবর্তীকালে ক্যানসার লিউকোমিয়া ইত্যাদি রোগে মারা যায়। যারা আরও কিছুটা দূরের মানুষ যাদের বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেলনা, তারা বংশ পরম্পরায় আজও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিচ্ছে। সেখানকার মাটি ও জলে আজও তেজস্ক্রিয়তা থাকার ফলে সুস্থ উদ্ভিদ পর্যন্ত জন্মাতে পারে না।

১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিলে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম ও ভয়ঙ্করতম পারমাণবিক চুল্লী দুর্ঘটনা ঘটে, চার নম্বর রিয়্যাক্টারের পাইল ক্যাপ বিস্ফোরিত হয়ে বিপুল তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, জলে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ মেগাকুরী। তাৎক্ষণিকভাবে ২৮ জনের মৃত্যু হল। শক্তিকেন্দ্র থেকে ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে এক লক্ষের উপর মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তেজস্ক্রিয়তার বিলম্বিত প্রভাব আগামী ৫০ বছর ধরে এদের বহন করতে হবে। মনে রাখতে

হবে রাশিয়ায় দুর্ঘটনা বলে আমরা মুক্ত নই। ঐ তেজস্ক্রিয়তা বাতাসের সাথে মিশে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পরেছে। এক বছরের মধ্যেই দূরবর্তী চাষীদের খামারে ৩৫০টি বাছুর, ৮৭টি শুকর ছানা ও ৬৪টি অন্যান্য জন্তু বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্মায়। ক্রিস্টোফার ক্লাভিয়ের মতে এই দুর্ঘটনা ভারতের মত জনবহুল দেশে ঘটলে তৎক্ষণাৎ মারা যেতেন এক লক্ষ মানুষ।

১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডের উইন্ডস্কেলের পরমাণু কেন্দ্র (এই কেন্দ্রে যুদ্ধাস্ত্রের জন্য প্লুটোনিয়াম তৈরী করা হ'ত)-এর এক নম্বর পাইলে দুর্ঘটনার ফলে আশাপাশের বিরাট খামারের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিনষ্ট করে ফেলতে হয়। ১৯৭৯ সালে আমেরিকার থ্রি মাইল আইলান্ডের পরমাণু কেন্দ্রে এক বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে। দাবি করা হয় এই দুটি বিস্ফোরণে নাকি বড় কোন ক্ষতি হয়নি। গোপনীয়তার বেড়াজাল ভেঙ্গে আসল তথ্য বের করা দুঃসাধ্য। কর্নাটকের কাইগা পরমাণু কেন্দ্রের একটা অংশ ভেঙ্গে পড়ায় ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত তথ্য নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে গোপনীয়তার বেড়াজালে গায়েব করে দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের তারাপুর কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য চুঁইয়ে পার্শ্ববর্তী ঘিভ্‌লি গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বেশকিছুদিন পর ২০ জন মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ায়। তেজস্ক্রিয়তা ঘাস থেকে গরুর দুধে, সেখান থেকে মানুষে পরিব্যপ্ত হয়েছে। এজন্য বলা হচ্ছে আজকের দিনে প্রতিটি শিশুই যেমন দেহে ০.২৫ মি.গ্রা. ডি.ডি.টি নিয়ে জন্মাচ্ছে, তেমনই সঙ্গে থাকছে কম পক্ষে এক ইউনিট স্ট্রনশিয়াম। খাদ্য থেকে গর্ভিনীর দেহে এবং সেখান থেকে ভ্রূনের শরীরে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চারিত হচ্ছে।

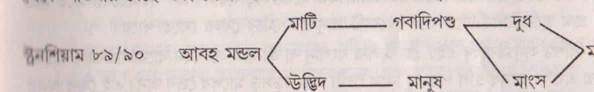

১৯৮৩ সালে মন্টি কার্লোতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তির ক্ষতিকারক দিক নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে সম্মেলন হয় তাতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের উত্তোলন, ভাঙ্গন, চুল্লীতে ব্যবহার, গোলাকরণ, পরিবহন, পূণর্ব্যবহার, আবর্জনা মুক্তকরণ ইত্যাদি ধাপগুলো ভীষণভাবে বিপজ্জনক এবং তেজস্ক্রিয়তার নিরাপদ মাত্রাটাও বাস্তবসম্মত নয়। তারা শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিরাপদ মনে করেন নি।

বংশানুবিদ্যার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বংশানু বা জীনকে বাঁচাতে শপথ নেওয়া হয়। তৎপরবর্তী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধিবেশনে (আগস্ট ১৯৫৬) বলা হয়েছিল কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা মাত্রই জীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

বিকিরণের পরিমাপ করা হয় প্রধানতঃ আয়োনি বিকিরণের মাধ্যমে জীবদেহের টিস্যু বা কলাসমূহ কর্তৃক শোষিত শক্তির বিচারে। বিকিরণের এরকম একটি এককের নাম 'র‍্যাড'। এক র‍্যাড বলতে বোঝায় এক গ্রাম জীবকলা কর্তৃক ১০০ আর্গ বিকিরিত শক্তি শোষণ। বর্তমানে র‍্যাড-এর পরিবর্তে আর একটি বড় একক ব্যবহার করা হচ্ছে, যার নাম গ্রে। ১ গ্রে = ১০০ র‍্যাড। বিজ্ঞানীরা একসময়ে

হিসাব করে দেখিয়েছিলেন ৮০০০ র‍্যাডে (৮০ গ্রে) বিকিরণ যে কোন মানুষকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে পারে। মাত্র ১৫০ র‍্যাডে ১০ শতাংশ মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ ১ গ্রে-র উপর যে কোন বিকিরণেই মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

বিকিরণের ফলে জীবদেহের কোষকলার কী পরিমাণ ক্ষতি হবে তা বিকিরণের ধরনের উপরে নির্ভর করে। প্রধানতঃ এক্স রশ্মি, বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি নিম্নমাত্রা এবং নিউট্রন কণা ও আলফা কণার স্রোত উচ্চমাত্রার বিকিরণের উৎস। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চমাত্রায় বিকিরণ জীবকণার যে ক্ষতি সাধন করতে পারে, ঐ একই ক্ষতি নিম্নমাত্রার যে পরিমাণ বিকিরণ করতে পারে ঐ পরিমাণকে প্রথম পরিমাণের 'ডোজ' ইক্যুইভ্যালেন্ট বলে। এর আধুনিক এককটির নাম 'সিভার্ট'। উচ্চমাত্রার ১ সিভার্ট বিকিরণ নিম্নমাত্রার ১ গ্রে বিকিরণের সমতুল। আগে এই উদ্দেশ্যে 'রেম' এককটি ব্যবহার করা হত। ১ সিভার্ট = ১০০ রেম। ১৯৩৪ সালে ইন্টারন্যাশানাল কমিশন ফর রেডিয়েশন প্রোটেক্‌শন (ICRP) নির্দ্ধারিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা বছরে ৩৬ রেম। ১৯২৫-এ ছিল বছরে ৫২ রেম। ১৯৫০ এবং ১৯৫৭ তে যথাক্রমে ১৫৩৫ রেম নির্দ্ধারিত হয়। ৮০-র দশকে আইনত সহনমাত্রা ০.৫ রেসে নামিয়ে আনা হয়। প্রকৃতিতে বিকিরণের স্বাভাবিক পরিমাণ বছরে ০.১ রেস। প্রকৃতপক্ষে এর উপরে যে কোন পরিমাণ বিকিরণই মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

উল্লেখযোগ্য যুক্তরাজ্যে শক্তিমন্ত্রকের প্রধান বিজ্ঞানী ক্যালভিন স্পেনসার বলেছিলেন মানুষ নিরাপদে প্লুটোনিয়াম নিয়ে ঘর করার মত যথেষ্ঠ বড় হয়নি। জন গফম্যানের মতে মাত্র ৪৫০ গ্রাম প্লুটোনিয়াম দিয়ে ২১০০ কোটি মানুষকে মেরে ফেলা যেতে পারে।

বিশিষ্ট অনুজীববিদ্ এইচ. জে. মুলার বংশানু বা জীনকে বলেছেন বায়োলজিকাল অ্যাটম। আদতে এগুলি অনেকগুলি পরমাণু নিয়ে তৈরী এক বড়সড় মাপের জৈব অনু। এই জৈব অনুর সঙ্গে প্রোটিন জুড়ে তৈরী হয় বংশসূত্র বা ক্রোমজোম। যেহেতু জীন বা ক্রোমজোমের মধ্যেই লুকানো থাকে একটি জীবের যাবতীয় সংগঠনের চাবিকাঠি সেহেতু জীন বিগড়ে গেলে সমস্ত জীবের পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। পারমাণবিক বিকিরণের ফলে উদ্ভুত তেজস্ক্রিয়তা ঠিক এই কাজটাই করে। অর্থাৎ লড়াইটা বেঁধে যায় ক্ষুদে পরমাণুর আর দৈত্যকার জৈব অনুর সঙ্গে।

লড়াই-এ জেতার নিয়মই হচ্ছে শত্রুপেক্ষের দুর্বল জায়গায় আঘাত করা। এই কারণে ভীমের গদা দুর্যোধনের হাঁটুতে গিয়ে আর প্যারিসের তীর অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে গিয়ে আঘাত হানে। ক্ষুদে তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলোও তাই জৈব অনু নিউক্লিক অ্যাসিডের ভ্রাতৃসুলভ বন্ধনীতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। ফলে বন্ধনীগুলো নড়বড়ে হয়ে যায়। নড়বড়ে বন্ধনীগুলো এ ওর সঙ্গে জুড়ে যায় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ জৈব বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ছাঁচগুলো যায় বেঁকেচুরে। তখন শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর তৈরী হয়। এই জৈব লন্ডভণ্ডের পারিভাষিক নাম মিউটেশন বা পরিব্যক্তি। মিউটেশন বেশী জায়গা জুড়ে অর্থাৎ ক্রোমজোমে হ'লে বলে ক্রোমজোমাল অ্যাবারেশন এবং জীনের স্তরে ঘটলে বলে পয়েন্ট মিউটেশন। দুই প্রকার মিউটেশনের ফলে কছু ক্ষতিকারক সংযোজন বা বিয়োজন হ'তে পারে। জীবের ক্ষেত্রে এর

পরিনাম হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। কারণ শুক্রানু ও ডিম্বানুর জীনে ক্ষতিকারক মিউটেশন ঘটলে ভ্রূণ গঠনকালে তা সন্তান সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

সামান্য পরিমাণ রশ্মির আঘাতে একটি জীনের পরিকাঠামো তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফলে কোন পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাই জৈবিক দিক থেকে নিরাপদ নয়। বিকিরণের মাত্রা কম হলে অনেকদিন পর ক্ষতিকারক দিকটি ফুটে ওঠে।

শুধু আনবিক ক্ষতি নয়। কোষপর্দা, কোষপ্রাচীর, কোষের মধ্যমণি নিউক্লিয়াস এবং কোষের জেনারেটর মাইটোকনড্রিয়ার গঠনেও মিউটেশনের ফলে অনেক বিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কোষের স্বাভাবিক বিভাজন বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা মাত্রাতিরিক্ত বিভাজনে ক্যানসার দেখা দিতে পারে। জীনের খামখেয়ালীপানায় কোমল কোষকলা, জননেন্দ্রিয়, বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক কাজ না করে সম্পূর্ণ জৈব সংগঠনটিকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে আসার অল্প পরেই একজন মানুষের শরীরের পরিপাকতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি হ'ল যথাক্রমে ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, বমন, আন্ত্রিক, পেটে খিঁচুনি, রক্ত পায়খানা, মুখে অনর্গল লালা নিঃসরণ, জলশূন্যতা ও ওজন হ্রাস। স্নায়বিক পেশী ব্যবস্থার ওপর প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ যথাক্রমে ক্লান্তি, অনীহা, নিদ্রালুভাব, অতিরিক্ত ঘাম, জ্বর, মাথার যন্ত্রনা, নিম্নরক্তচাপ, শক ও অজ্ঞান হওয়া। রক্তে বিকিরণের প্রভাবের প্রাথমিক লক্ষণ নাক মুখ দিয়ে রক্তপাত ও আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ। চূড়ান্ত পরিণতি স্থায়ী অ্যানিমিয়া ও রক্তে ক্যানসার। অবশ্য রক্তে ক্যানসারের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে সাধারণতঃ ৫ বছর এবং অন্যান্য ক্যানসারে ১৫ বছর সময় লেগে যাবে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণে শরীরের চামড়াও আক্রান্ত হয়। অধিক পরিমাণ বিকিরণে কয়েক মিনিটের মধ্যে চামড়া লাল হওয়া, চুলকানি, ছাল ওঠা ও জ্বালা পোড়া, রসকাটা দেখা দিতে পারে। বিকিরণের পরিমাণ কম হলে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে দু-এক সপ্তাহ দেরী হ'তে পারে। প্রসঙ্গত পোখরান বিস্ফোরণের দু-এক দিনের মধ্যেই নিকটবর্তী খেতলাই গ্রামের মানুষের বমিভাব, নাক দিয়ে রক্তপড়া ও চামড়ায় জ্বলাপোড়া শুরু হয়েছে। লক্ষণ বিচারে অনুমান করা যেতে পারে সেখানে বিস্ফোরণের পর ন্যূনতমভাবে ০.৫-১ গ্রে বিকিরণ অল্প সময়ের জন্য হলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে ঐ এলাকার কিছু মানুষের সাময়িক বন্ধ্যাত্ব দেখা যাবে। সাধারণভাবে ৬ গ্রে পরিমাণ বিকিরণে মহিলাদের স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব এবং পুরুষের শরীরে অন্ততঃ ১০-১২ বছরের জন্য বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। বিকিরণের পরিমাণ ০.৫-২.৫ গ্রে হলে বিকিরণের পর জন্মানো বাচ্চাদের একাংশের জীনগত ত্রুটি আসার সম্ভাবনা থাকে। আর কোন গর্ভবতী মহিলা সামান্য বিকিরণেও আক্রান্ত হয়ে থাকলে বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

জৈব বিবর্তন ও তেজস্ক্রিয়তা

১৯৫৯ সালে বিজ্ঞানী S. L. Miller একটি অক্সিজেনহীন আবদ্ধ পাত্রে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের মিশ্রনে ক্রমাগত বিদ্যুৎ মোক্ষন চালিয়ে পঁচিশ ঘণ্টা বাদে পাত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন সায়ানাইড, অ্যালডিহাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। পরবর্ত্তীকালে বিজ্ঞানী পোন্নামপেরুমা (Ponnamperuma) ১৯৬৫ সালে বিদ্যুৎ মোক্ষণের বদলে অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করে মিলারের পরীক্ষাটিকে পুনরায় সংঘটিত করে আরও বেশ কিছু নতুন যৌগ পেলেন। এদের মধ্যে ছিল পিউরিন, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান। নিউক্লিক অ্যাসিড জীবকোষে সর্বাপেক্ষা জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ, পৃথিবীতে প্রথম জীবের সূত্রপাত ঘটে প্রকৃতিতে DNA (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) ও RNA (রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) সংশ্লেষনের মধ্য দিয়ে। উপরের পরীক্ষাদুটি থেকে এটা পরিষ্কার যে DNA ও RNA র সংশ্লেষণে অতিবেগুনীরশ্মির (UV) একটা বড় ভূমিকা ছিল। এক্সরশ্মি ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির মত অতিবেগুনী রশ্মিও একধরণের আয়নীকারক বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও এক্স রশ্মি দিয়ে উক্ত পরীক্ষাটি করা হয়নি, করা হলে হয়ত একইরকম ফল হোত। যাইহোক, DNA ও RNA সংশ্লেষণে আয়নীকারক বিকিরণের একটা ভূমিকা ছিল। একটি DNA অনুতে চার রকমের ক্ষারীয় জৈব যৌগ থাকে যা জেনেটিক কোড গঠন করে। কুড়ি রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড় কী প্রোটিন তৈরী করবে— এটাই অতি সংক্ষেপে জেনেটিক কোড। কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য DNA অনুতে মোট ৬১টি কোড আছে। এই কোডের সাহায্যে জীবকোষ তৈরী করে হাজার হাজার উৎসেচক রস বা প্রোটিন। এব্যাপারে মানুষ এখনও সব কিছু জানতেও পারেনি।

কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসে থাকে ক্রোমোজম। ক্রোমোজম জীন দ্বারা গঠিত। আবার জীন মানে DNA অনু। একটি শুক্রানু ও একটি ডিম্বানুর নিষেকের ফলে উৎপন্ন ভ্রূণ থেকে শুরু করে এর পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অসংখ্য উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। সবগুলিই নির্দিষ্ট জেনেটিক কোড অনুযায়ী তৈরী হয়। একারণেই একটা নবজাত শিশু সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ঠিকভাবে জন্মগ্রহণ করে। যদি কখনও কোন ক্রোমোজমের কোন অবস্থানের জীন তথা DNA অনুর ক্ষারীয় যৌগের বিন্যাসে কোন রকম পরিবর্তন ঘটে তাহলে জেনেটিক কোডের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও প্রোটিন বা উৎসেচক তৈরীতে নানারকম পরিবর্তন আসতে পারে। কখনও কোন প্রোটিন তৈরী বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কখনোবা কোন নতুন প্রোটিন তৈরী হতে পারে, আবার কখনোবা কোনও প্রোটিনের পরিমাণের হেরফের ঘটতে পারে। এই পরিবর্তন সবসময় নবজাতকের মঙ্গলের জন্য হয়না। কখনও ক্ষতিও করে। ক্ষতিকর পরিবর্তনকে লেথাল মিউটেশন (Lethal Mutation) বলে। এমন হতে পারে কখনও লেথাল মিউটেশন ভ্রূণকে পূর্ণাঙ্গদশা পর্যন্ত বাড়তেই দিলনা, আবার কখনোবা নবজাতক নানা অঙ্গবিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করল।

মিউটেশন যে কারণে হয় তাকে মিউটাজেন বলে। মিউটাজেন ভৌত ও রাসায়নিক উভয় রকমেরই হতে পারে। ভৌত মিউটাজেন হিসারে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য আয়নীকারক বিকিরণ। পৃথিবীতে আয়নীকারক বিকিরণের প্রাকৃতিক উৎস প্রধানতঃ দু'টি। যথা পৃথিবীর পরিবেশে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং মহাজাগতিক রশ্মি। যখন মাথার উপর ওজোন গ্যাসের ছাতা ছিলনা তখন মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে প্রচুর আয়নীকারক বিকিরণ পৃথিবীতে প্রবেশ করত। কিন্তু ওজোন গ্যাসের স্তর তৈরী হবার পর এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিক কালে মানুষ এমন নির্বোধের মত কাজ শুরু করেছে যে ওজোন স্তরও একটু একটু করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি ক্রমহ্রাসমান। আমরা আগেই জেনেছি যে কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের ভর প্রতি মুহূর্তে বিকিরণের জন্য হ্রাস পায়। যে সময়ে কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের ভর অর্ধেকে পরিণত হয় তাকে সেই মৌলের অর্ধায়ু বলে। মোটামুটি দশটি অর্ধায়ু অতিক্রম করলে কোন তেজস্ক্রিয় মৌল তেজস্ক্রিয়তাহীন স্থায়ী মৌলের পরমাণুতে পরিণত হয়। অর্ধায়ুর এই নিয়মে বহু তেজস্ক্রিয় মৌল ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং অনেক তেজস্ক্রিয় মৌলের ভর হ্রাস পেতে পেতে নিঃশেষের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী কোন এক ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে তেজস্ক্রিয় মৌল চিরতরে বিদায় নেবে। অতএব যত অতীতের দিকে এগোব দেখতে পাব পৃথিবীর উপর তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা তথা আয়নীকারক বিকিরণের পরিমাণ ততই বাড়ছে অথবা উল্টোভাবে পৃথিবীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপরিভাগে আয়নীকারক বিকিরণের পরিমাণ কমেছে এবং কমছে।

পাশাপাশি জৈব বিবর্তনের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যত সময় এগিয়েছে জৈব বিবর্তনের হার তত হ্রাস পেয়েছে। আয়নীকারক বিকিরণের সঙ্গে জৈব বিবর্তনের সম্পর্ক সুগভীর। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আয়নীকারক বিকিরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ মিউটাজেন। এক প্রজাতি থেকে অপর এক প্রজাতিতে রূপান্তরের কারণও এই মিউটেশন। মিউটেশন যদি লেথাল হয় তাহলে প্রজাতি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অস্তিত্বহীন হয়ে পরে এবং লেথাল না হলে পৃথিবীতে টিকে যায়। আয়নীকারক বিকিরণের পরিমাণ যখন বেশী ছিল তখন ক্রোমোজম তথা জীনে মিউটেশনও বেশী ছিল। তখন ক্রোমোজম তথা জীনে মিউটেশনও বেশী ঘটত। ঘন ঘন প্রজাতির উদ্ভব এবং ঘন ঘন প্রজাতির বিলুপ্তি—এই ছিল সে সময়ে বিবর্তনের ধারার বৈশিষ্ট্য।

জৈব বিবর্তনের এই দৃষ্টিকোণে পরমাণু বিদ্যুৎ বা পরমাণু বোমা যাই হোক না কেন পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহার মানেই নতুন করে আয়নীকারক বিকিরণের মান বৃদ্ধি। মানুষের স্পৃহা ও চাহিদার কোন সীমা নেই। জৈব বিবর্তনের সেই অস্থির যুগ ফিরে আসতেই পারে যদি না অদূর ভবিষ্যতে পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করা যায়।

ধন্যবাদ নয় — ধিক্কার

পোখরানে '৯৮ এ পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা 'ভারতরত্ন' এ. পি. জে. কালাম বিস্ফোরণকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 'অভূতপূর্ব সাফল্য' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পরমাণু প্রযুক্তি ও সামরিক প্রযুক্তি মিলিত হলে তা পরমাণু অস্ত্র প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়। গত ১১ ও ১৩ ই মে-র ঘটনায় দেশ তারই সাক্ষী হয়ে রইল।" AEC এর চেয়ারম্যান ও DAE এর সচিব ডঃ আর. চিদাম্বরমের মতে, "ভারতকে শক্তিশালী হতেই হবে।" প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছেন "জয় জওয়ান, জয় কিসান, জয় বিজ্ঞান"।

এ অবস্থায় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বকে সাদরে অভিনন্দন জানানোর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক ডানেরা ডানদিক থেকে এবং রাজনৈতিক বামেরা (সংসদের অংশগ্রহনকারীরা) বামদিক থেকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত বিজ্ঞানীদের একটা অংশও পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর লক্ষ্যে আয়োজিত বিস্ফোরণের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছেন।

১৯৭৪ এর পোখরাণ বিস্ফোরণের অন্যতম প্রধান, বিজ্ঞানী রাজা রামান্না একবার মন্তব্য করেছিলেন—"বিজ্ঞানের কাছে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণের সঙ্গে জঙ্গী বিস্ফোরণের কোন তফাত নেই"। বোঝা যায় পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র তৈরী এবার জোর কদমে এগিয়ে চলবে। রাশি-রাশি পরমাণু বোমা স্তরে স্তরে সাজানো হবে, তৈরী হবে পৃথ্বী, অগ্নি ও তারচেয়ে বেশী ক্ষমতার ক্ষেপনাস্ত্র—যুদ্ধ শুরুর বার্তা পাওয়ার জন্য যা তাকিয়ে থাকবে কম্প্যুটারের বোতামের দিকে। আরো কার্যকরী, ব্যবহারযোগ্য বোমার জন্য কম্প্যুটার ও বিজ্ঞানীর বিদ্যা-বুদ্ধির মহড়া চলবে—ডঃ আয়েঙ্গার যাকে বলেছেন চতুর্থ প্রজন্মের পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র। ইউরেনিয়াম-প্লুটোনিয়াম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমার যুগের অবসান ঘোষণা করবে এই চতুর্থ প্রজন্মের পরমাণু অস্ত্র সম্ভার। সি.টি.বি.টি.-তে সই করা বা না করা দিয়ে এ সম্ভবনা যে রোধ করা যাবে না তাও বলেছেন DAE-র সচিব। অর্থাৎ মানুষ মারার গবেষণা চলবে—প্রয়োজন হবে আরো অনেক অনেক অর্থের।

মানুষের সভ্যতার পক্ষে ভয়ংকররকম বিপজ্জনক, প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রের থেকে গুণগতভাবে আলাদা পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল এদেশ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে। পৃথিবীকে শ্মশানভূমি করতে যুদ্ধবাজদের যে আয়োজন তাতে যুক্ত হ'ল আরো দুটি নাম—ভারত ও পাকিস্তান। 'ভারতরত্ন' কালাম, চিদাম্বরম, কাকোদর বা পাকিস্তানের আবদুল কাদের এর মতো নীতি নির্ধারক, ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানীর দল 'হল্লার রাজাদের' সামনে থাকলো ধ্বংসের কাজে সাহায্য করার জন্য, সভ্যতার কবর খোঁড়ার জন্য, 'লাশ-বিপনী' চালু রাখার জন্য।

পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও উন্নয়নে ব্যস্ত এসব বিজ্ঞানীদের পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল প্রায় চারদশক আগে, ১৯৫৯ সালে বলেছিলেন, 'মার্চেন্টস্ অব ডেথ' অর্থাৎ মৃত্যুর কারবারী—লাশ-বিপনীর বিক্রেতা। পরমাণু যুদ্ধ মানুষসহ সমস্ত প্রাণী ও জীবজগতের কী অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে, ১৯৪৫ সালের হিরোসিমা-নাগাসাকি তার প্রমান। ৬ই আগস্ট হিরোসিমায় প্রথম ধাক্কাতেই মৃতের সংখ্যা ৬৬ হাজার, দগ্ধ ৬৯ হাজার। এরপর ৯ই আগস্ট নাগাসাকি। অল্প সময়েই দু'লক্ষ মানুষের মৃত্যু। এরপর শুধুই মৃত্যু মিছিল—প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিকলাঙ্গতা। আজকের পরমাণু বোমাগুলি সে বিচারে সেদিনের চেয়ে অনেকগুণ শক্তিশালী। যদি এ সময়ে পরমাণু যুদ্ধ বাধে তবে সে যুদ্ধে যে কে জয়লাভ করলো তা দেখার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না। পরমাণু যুদ্ধের সম্ভবনাকে রোধ করার জন্য তাই বিভিন্ন তরফের উদ্যোগ, পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তাই এত ক্ষোভ। ধিক্কার তাই মৃত্যুর কারবারিদের বিরুদ্ধে।

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার ধ্বংসাত্মক রূপ, ১৯৫৪-র পর থেকে আরো ধ্বংসাত্মক হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিকে তেজস্ক্রিয় বিষভান্ডারে পরিণত করার চেষ্টা সমাজসচেতন বিজ্ঞানীদের একটি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—মানুষের দ্বারা অর্জিত সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীসহ এই পৃথিবীটাকে নিশ্চিহ্ন করতে, তিলে তিলে গড়ে ওঠা এই সভ্যতাকে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড় করাচ্ছে যে মারণাস্ত্রের বিভীষিকা, সেই অস্ত্রের উৎপাদনের কাজে সচেতনভাবে কী করে যুক্ত থাকতে পারেন বিজ্ঞানীরা?

পরমাণুর অন্তরে লুকিয়ে থাকা শক্তির সন্ধান পেতে অনেক অধ্যবসায়, গভীর নিষ্ঠা আর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কেটেছে বহু বিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণা জীবন—এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল তা। এর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন—রঞ্জেন, বেকেরেল, রাদারফোর্ড, বোর, প্লাঙ্ক, কুরী দম্পতি, আইনস্টাইন, ফেইনম্যান, চ্যাডউইক, জিলার্ড, টেলর, উইগনার, কুকস্, অটোহান, হাইজেনবার্গ, ওপেনহাইমার। তাঁরা চাননি এ আবিষ্কারের ফলে বর্তমান বা আগামী প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন বা বিকলাঙ্গ হয়ে যাক। হিটলারভীতি আইনস্টাইন, জিলার্ড বা উইগনারকে সক্রিয় করে তুলেছিল আমেরিকাকে পরমাণু বোমা বানানোর উদ্যোগী করে তুলতে যার ফলে গড়ে উঠেছিল বিশাল মানহাটন প্রকল্প। কিন্তু বোমা ফেলার আগেও তারা আমেরিকান রাষ্ট্রনায়কদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে ব্যর্থতার কাহিনী আজ ইতিহাস। উল্লেখযোগ্য যে ফ্যাসিস্ট জামানায় জার্মানীতে থেকে যাওয়া বিজ্ঞানী অটোহান, হাইজেনবার্গ পরমাণুর বিভাজনে শক্তি বার করে আনার গবেষণায় তখন অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু তারা যতটা না নতুন আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলেন, তার চেয়ে বেশী ব্যস্ত ছিলেন যাতে সেগুলো নাৎসীদের হাতে না পড়ে। ঐতিহাসিক সত্য এই যে তাঁরা এ ব্যাপারে গবেষণার কাজকে বিলম্বিত করেছিলেন। মানহাটান প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশই পরমাণু বোমা প্রয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন, প্রকল্প ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে যান। পরমাণু বোমার ট্র্যাজিডি আইনস্টাইনকে শেষ

জীবন পর্যন্ত বিষন্ন করে রেখেছিলো। তিনি আশা করতেন যে. সমাজকে একটা যৌক্তিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা যাবে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শুধু জনগণের কল্যাণেই প্রযুক্ত হবে। তিনি দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন—"আপনারা আপনাদের বিজ্ঞানীসুলভ যোগ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করে সর্বসমক্ষে দুনিয়াকে জানিয়ে দিন কী ভয়ংকর বিপদ বয়ে আনছে যুদ্ধের কারবারীরা।" বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জুলিও কুরী ১৯৫৭ সালে লিখেছিলেন—"বিপদটা যে কী ঘটতে পারে তা আমরা জানি এবং তাই মানুষকে সাবধান করার জন্য প্রানান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।" লন্ডনে ১৯৫৫ সালে বার্ট্রার্ন্ড রাসেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একটি আলোচনা সভা ডেকেছিলেন। সমগ্র মানবতার জন্য পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা ও আগামী পরমাণু যুদ্ধ কী পরিণতি ডেকে আনছে তা নিয়ে সে সভায় আলোচনা হয়। এদের মধ্যে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও প্রত্যয়ের পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এক যৌথ ইস্তেহারে ঘোষণা করেন—"বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার মানবজাতির কল্যাণের জন্য, ভবিষ্যত পরমাণু যুদ্ধের পরিণতিতে ধ্বংসের জন্য নয়।" এ আবেদন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। চারশর বেশী জাপানী বিজ্ঞানী দাবী করেছিলেন—"এখনই সমস্ত পরমাণু অস্ত্র নিয়ে গবেষণা বন্ধ হোক'। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানীর বিজ্ঞানীরা একটি ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন ম্যাক্স বর্ন, হাইজেনবার্গ। ছিলেন পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের আবিষ্কর্তা অটোহান, স্ট্রাঙ্গমেন এর মতো বিজ্ঞানীরা। তাদের ঘোষণার একটি অংশ—'মানব কল্যাণ ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে তারা পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করবেন না এবং পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন, তার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ও পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারে তারা কোনরকম সাহায্য করবেন না।"

এরকম বহু বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানীদের বহু সংগঠন, বিজ্ঞানীদের বহু সম্মিলিত বৈঠক থেকে পরমাণু বোমার ভয়ঙ্কর বিপদ বিবেচনা করে, পরমাণু বোমার কাজে বিজ্ঞানীদের সহায়তা না করার জন্য আজ পর্যন্ত বহু আবেদন প্রচারিত হয়েছে। এসব প্রচেষ্টার অন্যতম ছিল কানাডার নোভা কাটিয়ার অখ্যাত গ্রাম পাপওয়াসে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত স্বাধীন মনোভাবাপন্ন বিজ্ঞানীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে সমবেত বিজ্ঞানীরা ছিলেন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া অবদানের অধিকারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ঐ পাগওয়াশ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশতি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা যে ঘোষনা করেছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই যে—বিজ্ঞানের যে, ক্ষেত্রেই তারা কাজ করুক না কেন, তাদের পবিত্র দায়িত্ব হ'ল পরমাণু শক্তিকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের বিরদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আমরা মনে করি সমাজ সচেতন, মানবিকতাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী এরকই হওয়া উচিত।

এদেশে পরমাণু গবেষণার কর্তা সংগঠন ভাবা এ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC) এর বিজ্ঞানীরা এবারের বিস্ফোরণের পর কোমর বেঁধে সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। সহযোগী সংগঠন ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোটনের প্রধানসহ কয়েকজন বিজ্ঞানীও এই যুদ্ধায়োজনে সমর্থন জানিয়েছেন। বলা প্রয়োজন এই দুটি সংস্থা এদেশে পরমাণু শক্তি গবেষণা সংক্রান্ত

কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং BARC-র বিজ্ঞানীরা এবারের বিস্ফোরণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এছাড়া আরো কিছু বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এঘটনাকে সমর্থন করেছেন। বোঝা যায় নিজেদের পেশার জগতের বাইরে সমাজের জন্য এদের দায়বদ্ধতা প্রায় নেই বললেই চলে। এরা 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির জন্য প্রযুক্তি' এই বিজ্ঞানসর্বস্বতার শিকার, এক খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর ফেরিওয়ালা।

পৃথিবীজুড়ে এ ধরনের বিজ্ঞানীর সংখ্যা কিছু কম নয়। তাই নানা প্রতিবাদের ঐতিহ্য সামনে থাকা সত্ত্বেও মূল অবস্থাটার পরিবর্তনে বিজ্ঞানীমহলের নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিংহভাগ এখন সামরিক শ্রীবৃদ্ধির আয়োজনে যায়। বিজ্ঞানীমহলের অর্ধেকের বেশী বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক প্রয়োজনে চালু গবেষণার কাজে যুক্ত। সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধির পাশাপাশি পরমাণু গবেষণা ও মহাকাশগবেষনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয় যা মূলত প্রতিরক্ষা নামক রণসজ্জার কাজে নিয়োজিত।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণা এখন প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে বক্তি বিজ্ঞানীর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বিজ্ঞান সাধনা আজ নেহাতই ব্যতিক্রমী ঘটনা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণায় এখন স্পনসরশিপের যুগ। সে স্পনসরার কখনও রাষ্ট্র, কখনও শিল্পপতি। বিজ্ঞানীর স্বাধীনতা খর্বিত, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তিনি রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত, যেমনটি আমরা 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে পাই। দার্শনিক রাসেল বলেছেন, "এ সময়ে বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয়করণের সম্ভবনা আগের তুলনায় অনেক বেশী।" এ সময়ের প্রযুক্তির গায়ে তাই মুনাফার গন্ধ, রক্তের ছাপ। পোখরাণে আমরা তারই প্রকাশ দেখলাম, দেখলাম বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয়করণের রূপ। বিজ্ঞানীরা বললেন, "পোখরাণের বিস্ফোরণ কেবল সামরিক অগ্রগতি নয়, ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিও বটে।"

আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রতি অনেক মানুষের ধিক্কার আমরা পথে-ঘাটে শুনতে পাই। সামরিক কাজে, পরিবেশ ধ্বংসের কাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অমানবিক ব্যবহারের কারণে এটা গড়ে উঠেছে বলা যায়। একদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের কল্যানকর ভূমিকাকে প্রয়োগ করতে রাষ্ট্রের অনীহা এবং অন্যদিকে এর অপপ্রয়োগ—এই দুয়ের মাঝে পড়ে এক প্রানান্তকর অবস্থা বেশীরভাগ মানুষের। এই অসহায় অবস্থাই বিজ্ঞানের সঙ্গে, প্রযুক্তির সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বিচ্ছেদ তৈরী করে। বিজ্ঞানীকে গজদন্তমিনারের অধিবাসী বলে মনে হয়, বোমাই হয় বিজ্ঞানের প্রতিনিধি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জোশেফ নিডহ্যাম এর কথায়, "ফলিত বিজ্ঞান মানুষের সামনে এমন সব সম্ভবনা মেলে ধরবে যা নৈতিক দিক দিয়ে প্রায় দুঃসহ।...... ফলিত বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রনে রাখার সমস্যাই বোধ হয় আজ মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা।" কিন্তু তিনি একই সঙ্গে বলেন, 'উচ্চতম মার্গের সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানের প্রতি আমরা কোনভাবেহ আস্থা হারাইনি। আমরা বিশ্বাস করি বিজ্ঞান মানুষের যা ক্ষতি করেছে তার থেকে বহুগুণ বেশী উপকার করেছে।"। সেই সুরেই আমরা বলি বিজ্ঞান ধ্বংসের নয় সৃষ্টির প্রতীক। বিজ্ঞান জীবনের কল্যাণমন্ত্র। তাই যে ভারতীয় 'দেশপ্রেমিক' 'ভারতরত্ন' বিজ্ঞানীরা সামরিক বাহিনীর উর্দি পড়ে, সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেশে পোখরাণে হাজির

ছিলেন এবং পরমাণু বোমার 'সার্থক' বিস্ফোরণের আনন্দে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি তুলেছেন অভিনন্দন নয়, ধিক্কারই কেবল তাদের জন্য বরাদ্দ। আমরা চেন্নাইয়ের ইন্‌স্টিট্যুট্ অব ম্যাথামেটিকাল সায়েন্স-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রতিবাদী অন্য বিজ্ঞানী এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর প্রতিবাদী মানুষের পক্ষে। আমরা বিজ্ঞানের পক্ষে, আমরা মানবিকতার পক্ষে। আমরা মানুষের জন্য বিজ্ঞানের পক্ষে।

পরমাণু বোমা ও রাজনীতি

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও দেশের ৪০ কোটি মানুষ প্রায় অনাহারে দিন কাটায়। ৫০ শতাংশের উপর মানুষ নিরক্ষর। ৬০ শতাংশ মানুষের চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ নেই। বছরে ৫ লক্ষ মানুষ যক্ষায় আর ৫০ হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। ৫ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে ১৫ লক্ষের প্রতিবছর উদরাময়ে মৃত্যু ঘটে। অথচ যক্ষা, ম্যালেরিয়া, উদরাময় প্রভৃতি রোগ সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রনাধীন। দু'লক্ষ গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকু নেই। বহু গ্রামে প্রাথমিক স্কুল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের পশ্চাদ্‌পদতা থেকে মুক্তি তো দূরের কথা বরং শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ মদতে নিরন্ন মানুষ অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত। বিপরীতে এহেন দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগের জন্য বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক অবদানসহ বিপুল আয়োজন এবং তাকেই দেশের উন্নয়ন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা। এই মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ রক্ষার আয়োজন করতেই দেশ আজ বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত। একেবারে ঋণ ফাঁদের দোরগোড়ায়। জাতীয় আয়ের ২৬ শতাংশ যায় বিদেশী ঋণের সুদ গুনতে। যার প্রভাবে নিরন্ন মানুষই হচ্ছে আরও নিরন্ন। ঋণের শর্ত হিসাবে দেশের নীতি নির্ধারিত হয় বিশ্বব্যাঙ্ক, IMF-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশে। ফলতঃ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ভারত আজ নবরূপে পরাধীন। এহেন অবস্থায় এদেশের শাসকগোষ্ঠীও পরিত্রানের পথ খোঁজার চেষ্টা করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দাদাগিরি প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রব্যবসানির্ভর। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাতে সারা বিশ্বে যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরী করে অস্ত্র ব্যবসা চাঙ্গা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমেরিকার নেই। ভারতের দাদাগিরির লিপ্সা এবং অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে আমেরিকার এই উপমহাদেশে যুদ্ধ জিগির তৈরী করার অভিপ্রায়, দুই স্বার্থ আজ এক বিন্দুতে মিলিত। তারই চরম প্রকাশ পোখরানের সাম্প্রতিক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ।

বিশ্বে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির যে শীর্ষ তালিকা আছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, চীনের পর ষষ্ঠ স্থানটি দখল করার জন্য ভারত উদ্‌গ্রীব। বাধ সেধেছে পাকিস্তান। সেও ভারতের (১১ ও ১৩ মে, ১৯৯৮ তিনটে ও দুটো এবং ১৯৭৪ সালে একটি) মোট ৬টি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের উত্তরে ৭টি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সংখ্যায় এক বেশী। কিন্তু ভারত ৬টির মধ্যে একটি হাইড্রোজেন বোম এবং বাকী পরমাণু বোমাগুলি কিলো, মেগায় পাকিস্তানের উপরে। এহেন অবস্থায় বিশ্বের সকলের দাদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী? মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা C.I.A. নাকি অব্যবহিত পূর্বেও জানতে পারেনি পোখরানে ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের খবর। এরকম একটি কথায় সদ্যজাত শিশুও হেসে উঠবে নাকি! পরিস্থিতির অত্যন্ত সহজ বিশ্লেষণেও ধরা পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ

মদতেই ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বিজেপি জোট সরকার গঠনের পর থেকেই স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত পাকিস্তান বিরোধী কথাবার্তা এবং একেবারেই হঠাৎ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর চীনকে ভারতের এক নম্বর শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে বিবৃতি এই অঞ্চলে নতুন করে যে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরী করেছিল, এসবই ছিল পরমাণু বিস্ফোরণের ভিত্তিভূমি তৈরী করার পদক্ষেপ। জনস্বার্থবিরোধী ঘৃণ্য কাজের সপক্ষে, উগ্র-জাতীয়তাবাদের জোয়ারে মানুষকে ভাসিয়ে, জন সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা। এর ফলে এই উপমহাদেশে যে যুদ্ধ উন্মাদনা ও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তাতে সবচেয়ে লাভ অস্ত্র ব্যবসায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। প্রমাণ মেলে বিস্ফোরণের কিছুদিন পরেই তৈরী বাজেটে। প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ আরও কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের খবর আমেরিকা জানতে পারেনি, তাহলে প্রশ্ন আসে জানলে কি এই বিস্ফোরণ রুখে দিত? সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিস্ফোরণ সফল হ'ল কীভাবে। পাকিস্তানের বিস্ফোরণের আগাম খবরতো সারা পৃথিবীই জানতে পেরেছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তানের অবস্থান ভারতের থেকে অনেক দূর্বল এবং অর্থনীতিও ভারতের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া। তাহলে পাকিস্তানকে অনেক অনুরোধ এবং শাসানি সত্ত্বেও আমেরিকা তার বিস্ফোরণ বন্ধ করতে পারল না কেন? আমেরিকার সদিচ্ছা যদি সত্যি হয় তাহলে তো ধরে নিতে হয় সে তৃতীয় বিশ্বে তার দাদাগিরি করার ক্ষমতা হারিয়েছে। ফলতঃ এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতেই দুই দেশ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। লক্ষ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রচলিত অস্ত্রের বাজার চাঙ্গা করা।

এবারের ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট প্রস্তাবে 'পরিকল্পনা' খাতে প্রত্যক্ষ মানুষের উপকারে আসতে পারে এরকম ৭টি বিষয় : কৃষি, গ্রামোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বন এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন মিলে গত বছরের তুলনায় এবার মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে ৪,৮৯৮ কোটি টাকা। আর একমাত্র "দেশ রক্ষা" খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে ৫,১০১ কোটি টাকা। এর সঙ্গে যদি পারমাণবিক ও মহাকাশ গবেষণা বিভাগ দুটি যোগ করা হয় তবে মোট বৃদ্ধি দাঁড়ায় ৬,১৯৩ কোটি টাকা যা আগে উল্লেখ করা দেশের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত ৭টি বিষয়ে বৃদ্ধি থেকে ২৬ শতাংশের থেকেও বেশী।

বিশ্বের এক নম্বর দাদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতের এই বেয়াদপিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাই ভারতের প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব আইনে আছে তার সাহায্যপ্রাপ্ত কোন দেশ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটালে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করতে হবে। তাই আইন রক্ষার্থে সরকারী পর্যায়ে অবরোধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির এদেশে বিনিয়োগ যথারীতি চলবে। G-8 ভূক্ত দেশগুলির বৈঠকে দেখা গেল জাপান অবরোধ জারি করলেও জার্মানি বা ফ্রান্স শুধু নিন্দা প্রস্তাবেই ক্ষান্ত থাকল। আসলে ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিতেও ভারতের ১০০ কোটি জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ অর্থাৎ ১০ কোটি মানুষের যে ক্রয়ক্ষমতা তৈরী হয়েছে নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাসে, সেই বিশাল বাজার হারাতে চায় না

কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশই। এমনকি আমেরিকাও এখন স্বীকার করছে যে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ভারত ও পাকিস্তান যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমেরিকা নিজে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আইনের প্রবর্তক জন গ্লেন নিজেও আইনটিতে কিছু রদবদলের কথা ভাবছেন।

ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্ত থেকেই দেশের আভ্যন্তরীন সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাকে দূরে সরিয়ে রেখে এই উপমহাদেশে একটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষাখাতে বিপুল অর্থ খরচ করছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর দাদাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে।

শাসক শ্রেণীর একটি অংশের সংগঠন আর. এস. এস. কিন্তু উপমহাদেশে দাদাগিরি ছাড়াও বিশের দশক থেকে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ধীর অথচ অত্যন্ত মাপা পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। তারই সহযোগী রাজনৈতিক দল হিসাবে পূর্বতন জনসঙ্ঘ এবং বর্তমান বিজেপি ভারতের শাসনক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে অত্যন্ত পরিকল্পিত পথে চলেছে। বৃটিশ সৃষ্ট হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যা স্বাধীনতার পরে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর দ্বারাও লালিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মনে যে বিষ আজও রয়েছে তার চূড়ান্ত ব্যবহার করে বিজেপি ক্ষমতার অলিন্দে চলে আসে। কিন্তু সরকারের স্থিতিশীলতা ব্যতিরেকে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী রূপায়ন সম্ভব নয়। সেকারণে সংসদের অস্থিরতা দূর করতে, শরিকদের কোনঠাসা করতে এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের জোয়ারে দেশের মানুষকে ভাসিয়ে আগামী নির্বাচনী বৈতরনী পার হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই এই পরমাণু বিস্ফোরণ। আবার পরমাণু বিস্ফোরণের সাথে সাথে পোখরানের বিস্ফোরণস্থলে শক্তিপীঠ তৈরী এবং ওখানকার বালি ভারতের প্রতিটি মানষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা অর্থাৎ পরমাণু বিস্ফোরণকে ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রদান করে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা, পাশাপাশি মকবুল ফিদা হুসেন ও গোলাম আলীর উপর আক্রমন, পুনরায় রাম মন্দির তৈরীর তৎপরতা শুরু, এসবই আসলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথে এক একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যপক জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার তথা বিজেপি-র আর একটি অত্যন্ত সুচতুর পদক্ষেপ হঠাৎ করে নিজেদের অত্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিসাবে জাহির করে ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত ভারতের সাধারণ মানুষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতাকে নিজেদের স্বার্থে উসকে দিয়ে বিভ্রান্ত করা। সরকার গঠনের পর থেকেই দেশের উন্নয়নের প্রশ্নে স্বদেশীয়ানার ভন্ডামী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পরমাণু শক্তিধর দেশের 'সার্বিক পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ' নামক ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করে বোমা বিস্ফোরণ এবং বিস্ফোরণ পরবর্তীতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে পুঁজি করে বিজেপি দেখাতে চাইছে তারাই সাম্রাজ্যবাদের সাচ্চা বিরোধী। ৪৫ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত (দ্বিতীয় স্থানাধিকারী) ভারতবর্ষে, বিশ্বব্যাঙ্ক, IMF এর প্রত্যক্ষ মদতে উদারীকরণের নামে চলছে ব্যাপক বেসরকারীকরণ, কর্মচ্যুতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খরচ হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির লুণ্ঠনের জন্য দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে

দেওয়া। এসবই কি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নিদর্শন? পোখরান পর্বের এক সপ্তাহের মধ্যেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্তৃক তিনটি মার্কিন বিদ্যুৎ সংস্থার এদেশের লগ্নির পূর্বশর্ত হিসাবে দেওয়া অপমানজনক কাউন্টার গ্যারান্টির প্রস্তাব অনুমোদন করা, আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কৈফিয়ত জানিয়ে চিঠি দেওয়া, বোয়িং আর এনরণ কে দিয়ে মার্কিন সরকারের মানভঞ্জনের জন্য কাকুতি মিনতি সাচ্চা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা বই কি! C.T.B.T.-তে সই না করার সিদ্ধান্তে দৃঢ় না থেকে পরমাণু বিস্ফোরণ প্রমাণ করে ভারত সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী না হ'য়ে আসলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের শরিক হতে চায়। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী চায় C.T.B.T.-তে সই করার আগে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে।

বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি বিভ্রান্তিমূলক প্রচার দেশীয় নিরাপত্তা। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিচারে একমাত্র চীনই পারে ভারতকে বেকায়দায় ফেলতে। সেই চীনের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের একবারই যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৬২ সালে। তারপর গত ৩৬ বছর চীনের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক না থাকলেও প্রতিনিয়ত চীন ভারতকে শাসিয়েছে এমন নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ দুবার যুদ্ধ হয়েছে। দুবারই পাকিস্তান পর্যুদস্ত হয়েছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে মূল বিরোধ কাশ্মীরের যে অংশটুকু নিয়ে তা উভয় দেশের সদিচ্ছায় আলোচনার দ্বারাই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। প্রতিবেশী অন্যান্য দেশগুলি ভারতের মত একটি বৃহৎ দেশের সাথে যুদ্ধের কথা ভাবতেই পারে না। তাহলে কী প্রয়োজন দেশের মানুষকে ক্রমাগত দৈন্য করে প্রতিরক্ষা খাতে এই বিপুল ব্যয়ের। সর্বোপরি কোন্ বাস্তব প্রয়োজনে ভারতের পরমাণু শক্তিধর হওয়ার ইচ্ছা? আসলে ভারত পরমাণু শক্তিধর হ'তে চাইছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর হয়ে এই উপমহাদেশে দাদাগিরি করার জন্য। প্রতিরক্ষার প্রশ্নে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ড এবং জাপানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রতিরক্ষাখাতে বিপুল ব্যয় করে পৃথিবীতে নিজেকে অন্যতম প্রধান শক্তিশিবির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের হাত থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে রক্ষা করার ভূমিকা পালন করেছিল। প্রচলিত অস্ত্রের বিপুল সম্ভার ছাড়াও সোভিয়েত ৬০০০-এর উপর পরমাণু বোমার অধিকারী। সেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ধ্বংস হয়ে গেল। তথাকথিত বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিরাপত্তা দান করতে পারল না এবং সোভিয়েত ধ্বংসের জন্য আমেরিকাকে একটি পরমাণু বোমাও ব্যবহার করতে হয় নি। বিপরীতে সুইজারল্যান্ডের বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে কোন বরাদ্দ থাকে না। সুইজারল্যান্ডের প্রতিবেশী দেশগুলো কিন্তু দেশটাকে দখল করে নেয় নি এবং এই সুযোগে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নজর দিতে পারায় সুইজারল্যান্ড আজ একটি উন্নত দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আত্মসমর্পনের শর্ত অনুযায়ী জাপানের প্রতিরক্ষাখাতে যথেচ্ছ খরচ করার অধিকার নেই। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের উপর মিত্রশক্তির এই আরোপিত শর্ত কতটা নৈতিক সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু সেই শর্ত জাপানের কাছে শাপে বরের মত। দু দুটি পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত একটি দেশ বিগত ৫০ বছরে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে যে আজ সে বাজার দখলের লড়াইয়ে আমেরিকাকে টক্কর দিচ্ছে। অর্থাৎ

ভাঙ্গাচোরা দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উন্মাদের মত আচরণ কোন দেশকে নিরাপত্তা যেমন দিতে পারে না তেমনই বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়েও তাকে কোন জায়গা করে দেয় না। ফলে ভারতের শাসক গোষ্ঠীর একান্ত ইচ্ছা (উপমহাদেশে দাদাগিরি) বাস্তবায়িত করতে গেলেও প্রয়োজন অর্থহীন, আত্মধ্বংসকারী পরমাণু কর্মসূচী বন্ধ করে প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেশের প্রকৃত উন্নতির দিকে নজর দেওয়া।

সাম্প্রতিক এই বোমা বিস্ফোরণের প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠীর অংশীদার অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি, যাদের এই মুহূর্তে লোকসভায় বিরোধী অবস্থান, তাদের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ডান বাম সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলিই তাদের বক্তব্যে পরমাণু বোমা বা পরমাণু প্রযুক্তির বিরোধিতা করেনি বরং আবুল কালামসহ এই কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিজ্ঞানীদের(?) অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত গোপন ভাবে সংসদে আলোচনা না করে এবং এরকম অনুপযুক্ত(!) সময়ে বোমা বিস্ফোরণের জন্য বিজেপি জোট সরকারের বিরোধিতা করেছে। একটি বিষয় খেয়াল করা প্রয়োজন বিজেপি জোট সরকার গড়ার ৫৪ দিন পর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই ৫৪ দিনে ৫টি পরমাণু বোমা বানিয়ে ফেলা সম্ভব নয় একথা সকলেই বোঝে। ফলে এর প্রস্তুতি পূর্ববর্তী সরকারগুলির আমলেও চলছিল। সবচেয়ে বড় কথা ১৯৯৫ সালে কংগ্রেস সরকারের আমলেও বিস্ফোরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। এরকম আংশিক এবং অস্বচ্ছ বিরোধিতার দ্বারা কোন ফ্যাসিস্ট শক্তির গতি রোধ করা যায় না।

নিরস্ত্রীকরণ ও আমাদের ভাবনা

১১ ও ১৩ই মে'র পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ এবং পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা, DAE-র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও অন্যান্য সরকারী প্রতিনিধিদের বক্তব্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এর উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলবে জোর কদমে। ইতিমধ্যে সামরিকখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাকাশ গবেষণা ও পরমাণু গবেষণায় বিগত বছরের বাজেট বরাদ্দকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির চূড়ান্ত বিপর্যয়। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অবরোধের সিদ্ধান্ত সমস্যাকে আরো জটিল করবে। দেশের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব পালনে সরকার আরো উদাসীন হবে—দেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আরো অনেক কমবে নিঃসন্দেহে। জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ জিগির জাগিয়ে তোলা, দেশের মানুষকে উগ্রজাতীয়তাবাদের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের বুঝিয়ে দেয় শাসক শ্রেণী যে সংকটের আবর্তে প্রতিদিন ডুবছে, এ বোমার রাজনৈতিক গুরুত্ব সে সংকটে শাসকশ্রেণীর ভেসে থাকার চেষ্টায় নিহিত। সাধারণ মানুষের স্বার্থের তা বিপরীত।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা ভারতের পঞ্চশীল নীতিতে প্রতিফলিত ছিল। সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় মাঝে মধ্যে এ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। তবু ভারতের জনগণের চাহিদার প্রতিফলনে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে চলতে হয়েছে বিগত সময়ের সরকারগুলিকে। গত কয়েক বছরে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতির ঘটনাও ঘটেছে। যে পাকিস্তানকে প্রধানতম শত্রু হিসাবে দেখানো হচ্ছে, সে দেশের সামরিক ও মৌলবাদী শক্তির ভারতবিদ্বেষ সত্ত্বেও, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদেশের মানুষের মত-বিনিময়, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বিনিময়ের নানা উদ্যোগ কয়েক বছরে গড়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গেও ইতিমধ্যে কয়েকটি বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছে। উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যেকার সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে অগ্রনী ভূমিকা ভারত নিতে পারতো সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণ সে সম্ভবনাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিল। এই উপমহাদেশে কর্তৃত্ব করার আকাঙ্খা একদিকে যেমন পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করলো, অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলির আক্রমনের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠলো ভারত। বলা যায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ৫৪ দিনের মাথায় বর্তমান বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি যে আক্রমনাত্মক পরমাণু নীতি গ্রহণ করল তা দেশের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল।

বসুন্ধরা সম্মেলন পৃথিবীর পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য উন্নত দেশগুলির ভূমিকার সমালোচনা ও এ ব্যাপারে আনুপাতিক হারে দায়বন্টনের দাবী তুলে ভারতের প্রতিনিধি তৃতীয় বিশ্ব তথা অনুন্নত দেশগুলির নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বে সম্মানের আসন পেয়েছিল। একইভাবে

বৈষম্যমূলক এবং অবমাননাকর শর্তের জন্য NPT বা CTBT তে স্বাক্ষর না করে ভারত সঠিকভাবেই এই চুক্তির মাধ্যমে পরমাণুশক্তিধর দেশগুলি প্রধানত আমেরিকার স্বার্থান্বেষী ভূমিকাকে বিশ্বের সামনে হাজির করেছিল এবং এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশ্বজনমতের সমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু অনুন্নত বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করার পথ ছেড়ে ভারত শক্তি প্রদর্শন ও প্রয়োগের জন্য ধরলো এমন একটা পথ যা গিয়ে হারিয়েছে গভীর অন্ধকারে। যুদ্ধ উন্মাদনার অন্যতম নায়ক হিসাবে 'নিউক্লিয়ার ক্লাব'-এর সদস্য হবার জন্য ভারতের শাসক শ্রেণী আজ উন্মাদ। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এক পৃথিবীর স্বপ্নকে চুরমার করে দিতে মার্কিনসহ দুনিয়ার যুদ্ধবাজদের সম্মিলিত ভূমিকাকেই সে শক্তিশালী করলো। প্রতিবেশী পাকিস্তানের যুদ্ধোন্মাদ, মৌলবাদী শাসকশ্রেণী আর ভারতের শাসকশ্রেণী এখানে একই সুরে বাঁধা, একই পথের পথিক।

আমরা অস্ত্রমুক্ত, যুদ্ধমুক্ত এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কোন এক সুপ্রভাতে মন্ত্রবলে সেই শান্তির পৃথিবী তৈরী হয়ে যেতে পারে না। যুদ্ধ হচ্ছে অন্য পন্থায় রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগ্রামের মধ্যে থেকে যুদ্ধের উৎপত্তি, তা থেকে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যুদ্ধ ও অশান্তির কারণ একদল যুদ্ধবাজ। তারা তাদের অস্ত্র ও অর্থবলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে আসছে। তাদের ভাণ্ডারে আজ যত পরমাণু বোমা আছে তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রায় ১৩ হাজার মিলিয়ন টন। এই ক্ষমতা দিয়ে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার আকারের যতগুলি পরমাণু বোমা বানানো যায়, প্রতি মিনিটে একটা করে ফাটালে তা শেষ করতে ৭২২ দিন অর্থাৎ প্রায় দুবছর লাগবে। এছাড়া রয়েছে বোমা নিক্ষেপ করার জন্য মিসাইল ও বোমারু বিমান। ১৯৮৫-এর হিসাব অনুযায়ী একমাত্র USA এবং তদানীন্তন USSR-এর হাতেই মোট মিসাইলের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৯০ এবং ২২৯৮টি। চীন, UK ও ফ্রান্সের হাতেও রয়েছে পরমাণু অস্ত্রনিক্ষেপকারী বেশ কিছু মিসাইল। অতুলনীয় ধ্বংস ক্ষমতার অধিকারী আনবিক অস্ত্রের ঝনঝনানি তুলে তারা দেশে দেশে সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে সংগ্রামরতদের ভয় দেখাতে চায়। আমরা তাই চাই বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রাদির পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হোক। পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ ও ধ্বংসসাধন তাই আমাদের দাবী। এ ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের খবরদারী করার প্রচেষ্টারও আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

আমরা স্পষ্টতই মনে করি 'শান্তির জন্য পরমাণু' শ্লোগানটি একটি ধাপ্পা। পরমাণু শক্তি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য বিদ্যুৎ নয়, পরমাণু অস্ত্রের রসদ সংগ্রহ। এ পরিকল্পনা দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের পক্ষেও বিপজ্জনক। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প বাতিলের দাবীও তাই আমরা সোচ্চারে তুলে ধরতে চাই। এ প্রসঙ্গে আমরা ভারতে AEC-কে মাত্রাহীন ক্ষমতা প্রদানকারী, অগণতান্ত্রিক Atomic Energy Act (1962) বাতিলের দাবী তুলছি।

অস্ত্র তা প্রযুক্তিগতভাবে যতই উন্নত ও ধ্বংসসাধক হোক, মানুষের চেয়ে কখনই বড় হতে পারে না। জনগণই ইতিহাসের চালিকা শক্তি, ইতিহাসের স্রষ্টা। তাই দেশে দেশে শান্তিকামী জনগণের সম্মিলিত সংগ্রামের বিকাশের মধ্যে দিয়েই কেবল সুনিশ্চিত হতে পারে আগামী দিনে শান্তির সম্ভাবনা। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যুদ্ধের পালক পিতা তাকে ধ্বংস করার সংগ্রামের তীব্রতা বাড়িয়েই আমরা পৌঁছে যেতে পারি যুদ্ধমুক্ত, পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এক পৃথিবীর অন্তর্লোকে। আমরা তাই বলতে চাই—যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই, যুদ্ধবাজদের ধ্বংস ছাড়া এই দুনিয়ায় শান্তি নাই।

আরো জানার জন্য

1. India's Nuclear Estate By Dhirendra Sharma
2. Nuclear Power By Walter Patterson
3. Poisoned Power By Jhon Goffman and A. Tamplin
4. The Menace of Atomic Energy By R. Nader and Jhon Abbotts.
5. Hirosima to Harrisburg By Jim Garrison.
6. Economic And Political Weekly, Vol XXII, No–15, April–II, 1987
7. Economic And Political Weekly, Vol XXI, No–34, Aug 23. 1986
8. Economic And Political Weekly, Vol XXIII, No–5, Jan 30, 1988
9. Economic And Political Weekly, Vol XXXII, Nos 20 & 21, May 17-23/24-30, 1997
10. Nuclear Power and You By Nuclear Power Corporation, 1990.
11. Nuclear Power in India By Hart David.
12. Nuclear Radiation in warfare By Stockholm International Peace Research Institute
13. Brighter than thousand Sun By Jugnk
14. বিশ্বাসঘাতক : নারায়ণ সান্যাল
15. নির্বাপিত সূর্যের সাধনা : জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়
16. Justice down-Wind By Haward Ball